প্রচ্ছদ রচনা ১

একটা সাইক্লোন

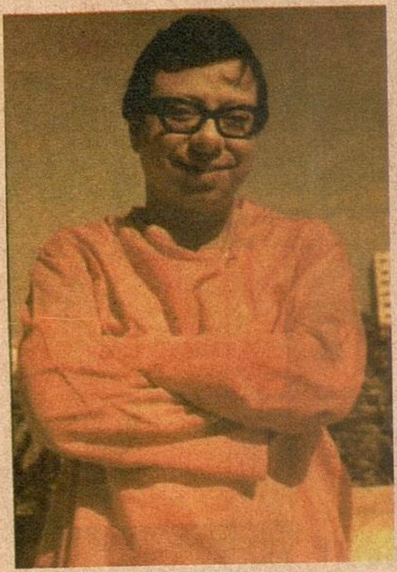


যা আরব সাগর থেকে উঠে বঙ্গোপসাগরে ঢেউ
তুলে ভারত মহাসাগর হয়ে আটলান্টিক-
প্যাসিফিক-এ ছুটেছিল, সে হঠাৎ সূর্যকে
লক্ষ করে উর্দ্ধ্বগামী হল; পৃথিবীর
জল থিতিয়ে গেল।
ক্ষণজন্মা প্রতিভারা
এভাবেই আসে
অপ্রত্যাশিত।
অকল্পিত, অসম্ভব
প্রত্যাশার সৃষ্টি করে
আবার চলে যায়
অপ্রত্যাশিত। পৃথিবীর
খরাকে রসান্বিত ক'রে,
উর্বর ক'রে হঠাৎ নির্বাসিত হয়।
ভবিষ্যৎ হয় উদ্ভাসিত।

...সলিল চৌধুরী

রাহুলদেব

শুভ দাশগুপ্ত



গানের দেশে ঘর আমার
গানে জাগি গানেই ঘুমোই।

নদীমাতৃক এই দেশকে গানমাতৃক বললে বোধহয় ভুল হয় না। ভোরের আধফোটা আলো থেকে গহন রাতের নিঃস্তব্ধ শূন্যতা—গান নেই কোথায়? গ্রামের সবুজ সারল্য থেকে শহুরে হুল্লোড়—গান সর্বত্রগামী। ধর্ম থেকে ফুটবল, ভ্রমণ থেকে সভা সমাবেশ—গানের ঠাঁই সবখানে।

গানের প্রসঙ্গ উঠলেই কত সব বিস্ময়কর প্রতিভা আর তাঁদের আশ্চর্য সৃষ্টির কথায় মন ভরে ওঠে। কত বর্ণের কত ভাবের কত বিচিত্র সব গান। মায়াময় সৃজন! লঘুসংগীতের কথা আলাদা করে ভাবতে বসলে কিছু নাম অনিবার্যভাবেই সার্থকতার প্রতীক হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। সেই সব অমোঘ নামের তালিকার একেবারে শুরুর দিকেই চিরস্থায়ী উজ্জ্বলতায় ভাস্বর একটি নাম—রাহুল দেববর্মন। পরম শ্রদ্ধায় ভালবাসায় বিস্ময়ের মুগ্ধতায়, যে-নাম অসংখ্য স্মৃতিধার্য গানের অনুষঙ্গে বারবার উচ্চারিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হয়ে চলবে।

কৃতী পিতার পুত্র হওয়ার সুবিধে অনেক। অসুবিধেও কম নয়। অসুবিধেটা তখনই বড় হয়ে দাঁড়ায়, যখন পুত্রও পিতার মতো একই কাজে সাফল্যের নতুন দিগন্ত অন্বেষণে ব্রতী হয়। এক্ষেত্রে আশাপূরণের নজির কমই। সাফল্য জুটেছে হাতে গোনা দু'একটি ক্ষেত্রে। রাহুল দেববর্মন সেই বিরল ব্যক্তিত্ব—যিনি শুধুই পিতার অনুসারী হননি, নিজেকে বিস্তৃত করেছেন ভিন্নতর সফলতার সীমান্তেও। অনন্য সুরস্রষ্টা, কিংবদন্তী গায়ক শচীনকর্তার পুত্র অন্তত লঘুসংগীতের সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে বহুদিক থেকেই, পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবনত থেকেও অন্যতর প্রয়োগসাফল্যে ছাপিয়ে যেতে পেরেছেন তাঁর অগ্রজ সব মহান স্রষ্টাদের। প্রতিভা, অধ্যবসায়, দক্ষতা আর উদ্ভাবনী শক্তি, সবক্ষেত্রেই রাহুলদেব ছিলেন অনন্য। সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন অসাধারণ কয়েকজন যন্ত্রশিল্পীকে, যাঁরা রাহুলদেবের নিত্যনতুন সৃজনকে বারবার সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের অবিশ্বাস্য কৃতিত্বে। পেয়েছিলেন পছন্দমতো গীতিকারদের, যাঁদের কলম সদাতরুণ পঞ্চমকে নিত্যনতুন সুরবিভঙ্গে মাতিয়ে তুলতে পেরেছিল। পেয়েছিলেন বিশ্বমানের অনন্য গায়ক গায়িকাদের, যাঁদের কণ্ঠ অমর করে রেখেছে তাঁর অপূর্ব সব সৃষ্টিকে।

সত্যিকথা বলতে গেলে, এদেশে, আসল গণসংগীত হয়ে উঠেছে সিনেমার গান। মনে রাখার মতো প্রচুর ভাল গান গত পাঁচ দশকে আমাদের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করেছে। ভারতীয় এবং ভিন দেশীয় কোনও সুর কোনও ছন্দ বা বিশেষত্বই সেখানে অপাঙক্তেয় হয়নি। 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে' করে গোটা পৃথিবীর সুর-তাল-ছন্দই অদ্ভুত এক রসায়নে ভারতীয় সিনেমার গানে জায়গা করে নিয়েছে। সিনেমার গান নিয়ে অনেকের অনেক উন্নাসিকতা থাকতেই পারে। কিন্তু যিনি যাই বলুন, জনতার গান বলতে সিনেমার গানই বরাবর চ্যাম্পিয়ন, আর সে ক্ষেত্রে সত্যিকারের ভাল গানের ভাণ্ডারটি নেহাত ছোট নয়।

রাহুল দেববর্মন শুরু করেছেন সিনেমার গান দিয়েই। সেটাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। সিনেমার গানের সফল স্রষ্টা হিসেবে ঘরের চৌহদ্দিতেই পেয়েছেন পিতা শচীনদেবকে। কী অপরিসীম মাধুর্যময় শচীনদেবের সব গান—আর কী অসামান্যরূপে তারা জীবন্ত হয়ে উঠত হেমন্ত, মান্না, রফি, লতা, তালাতকণ্ঠে কিংবা মুকেশ, গীতা দত্ত, আশা ভোঁসলের নিবেদনে! ছেলেবেলা থেকেই এই অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ রাহুলদেব। তাই, যতই নিজেকে গড়ে তুলুন সরোদ শিল্পীরূপে, যতই তালিম নিন তবলায় কিংবা পাশ্চাত্য রিদমে, যতই মনোনিবেশ করুন হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয়সংগীতে বা পশ্চিমী কনসার্টে—আসলে রাহুলদেবের বিধিনির্দিষ্ট গন্তব্য ছিল সুরস্রষ্টার। 'ছোটে নবাব' নামের হিট না হওয়া এক সাধারণ চলচ্চিত্র দিয়ে যাত্রা শুরু। শুরুর দিকে কয়েকটা বছর টানাপোড়েনের মধ্যে কেটেছে। তার মধ্যেও চমকে দিয়েছেন কোনও কোনও ছবির দু'রকম গানের মেকিং-এ। এখানে দুটি গানের উল্লেখ করছি কী অনন্যপূর্ব নির্মাণ! আসমুদ্র হিমাচল তোলপাড় করা সেই ভিনদেশী বিভঙ্গের গান—'আও টুইস্ট করে'-'ভূতবাংলা' ছবির যে গান আজও আমাদের নেচে উঠতে বলে! যে গানে choral এর ব্যবহারে বিস্ময়কর মুনশিয়ানায় রাহুলদেব দেখিয়েছিলেন কী করে অন্য দেশের জিনিসকে নিজের মতো করে গড়ে নিতে হয়। এর পাশাপাশি মনে আসে ' বাহারোঁ

কে সপনে' ছবির সেই গান-'চুনরি সম্হাল



গোরী'। লতা-মান্নার দ্বৈতকণ্ঠে সেই মজাদার গান, যার পরতে পরতে রাহুলদেব জড়িয়ে দিয়েছিলেন লোকগানের রঙদার জৌলুস আর অবাক করা পশ্চিমী সুরবিন্যাস! সঙ্গে ছিল তালবাদ্যের নতুন ধরনের ব্যবহার।

গুটিপোকা প্রজাপতি হয়ে উঠল 'তিসরী মঞ্জিল' ছবিতে। তখনকার তরুণ মনের 'হিরো অফ দ্য হিরোস'-শাম্মী কাপুর ছিলেন সে ছবির নায়ক। আজও টিভি চ্যানেলে কখনও ছবিটি দেখানো হলে অনেকেই বসে পড়েন গান শোনার লোভে। অভিনয়, ক্যামেরা, সেট সেটিং, পরিচালনা আজ কিছুটা সেকেলে মনে হলেও হতে পারে, কিন্তু সেই সুপারহিট গানগুলি আজও সমানভাবে মাতায়। ভাবায়ও। কী অভিনব বিন্যাস! অথচ কোথায় যেন রয়ে গেছে অনিবার্য এক চিরন্তন মাধুর্যের টান। মনে আছে সেই গান? 'আজা আজা ম্যায় হুঁ প্যার তেরা?' আশা ভোঁসলে আর মহঃ রফির কণ্ঠমাধুর্য, নবতর প্রকাশ ভঙ্গিমায় কেমন আবিষ্ট করেছিল আমাদের মনকে!

আসলে নিরন্তর নতুনের খোঁজ রাহুলদেবের রক্তেই ছিল। শচীনদেব বাংলা থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন ভাটিয়ালি কীর্তন আর কাব্যসংগীতের রসমাধুরী, শাস্ত্রীয়গানের বহুবর্ণরঞ্জিত সুর ও ছন্দের মিশ্রণে যার অভূতপূর্ব সমন্বয় তিনি হিন্দিছবির গানে ঘটাতে পেরেছিলেন। রাহুলদেব সেই ধারাকে আরও অনেক দূর বিস্তৃত করলেন তাঁর দুরন্ত প্রতিভার স্পর্শে।

কারবাঁ, প্যার কা মৌসম, ইয়াদোঁ কী বারাত, হরে রাম হরে কৃষ্ণ, ধরম করম, এসব ছবির গান ইতিহাসের পাতায় ক্রমাগত সোনার অক্ষরে লিখে যেতে লাগল পঞ্চমের কৃতিত্ব আর সাফল্যের কথা। এর আগে আমরা ভাল গান কম পাইনি। নৌশাদ থেকে শঙ্কর জয় কিষণ, ও.পি.নাইয়ার থেকে রবি, কল্যাণজী আনন্দজী, খৈয়াম থেকে রোশন, হেমন্তকুমার থেকে লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল—মনমাতানো গানের ঝর্ণাধারায় স্নান করিয়েছেন সকলেই। প্রত্যেকেরই ছিল নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। মদনমোহন থেকে উষাখান্না--সকলেরই রয়েছে অনিন্দ্যসুন্দর সংগীতসম্ভার, যার জন্য গর্বে অহঙ্কারে ভালবাসায় আপ্লুত আমরা। তবু রাহুলদেব কোথায় যেন একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। অনন্যতার এক আশ্চর্য মোহবিস্তারী শিলমোহর। 'অমরপ্রেম' 'আপ কি কমস', 'নমক হারাম', 'ঘর', 'হম কিসিসে কম নহী'—কত অবিস্মরণীয় ছবির মনকাড়া সব গানের

রত্নভাণ্ডার। রাহুলদেব যা ছুঁয়েছেন, সবই প্রায় মিডাস্ টাচ। পঞ্চম মানেই সাফল্যের গ্যারান্টি। 'ইজাজৎ', 'শোলে', 'সীতা ঔর গীতা', 'মেহবুবা', 'আপনা দেশ', ভোলা যাবে কখনও এ সব ছবির

গান? অসম্ভব!!

সিনেমার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক নিয়ে যদি কারও নাম সফলতার চূড়ান্ত স্তরে বিবেচনা করতে হয়, সে নাম নিঃসন্দেহে রাহুলদেব বর্মনের। প্রিলিউড ইন্টারলিউডেও তাঁর অনন্যপূর্ব সাংগীতিকবোধের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের বিস্মিত করে। ভুলতে পারবেন 'চুরা লিয়া হ্যায়' গানের প্রিলিউড গিটারের সুরবিন্যাস? ভুলতে পারবেন 'দম মারো দম' গানের ইন্টারলিউডে গিটারের অভিনব প্রয়োগ, যা গানটিরই অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে বেঁচে আছে আজও। 'কারবাঁ' ছবিতে 'আরে হো গোরিয়া কঁহা তেরা দেশ রে' (আশা-রফি দ্বৈতকণ্ঠে) গানের ইন্টারলিউডে আশাকণ্ঠে folk attitude কী নিপুণ উচ্চারণে বিন্যস্ত করেছেন রাহুলদেব! এর জুড়ি নেই ভারতীয় সিনেমার গানে। ভুলে যেতে পারবেন 'শোলে' ছবিতে স্বকণ্ঠে গাওয়া রাহুলদেবের 'মেহবুবা মেহবুবা' গানে রিদম-এর অসামান্য ব্যবহার? কিংবা ইজাজৎ ছবির গানের অনন্য ছন্দোবৈচিত্র? সুরবিস্তার? না। এসব ভোলা যায় না। যাবেও না। এজন্যই পঞ্চম চিরজয়ী। চিরজীবী।

প্রিলিউড ইন্টারলিউডের অসামান্য প্রয়োগভাবনার কথা বলতে গেলে আরও বহু জনপ্রিয় গানেরই উল্লেখ করা যায়। দুটি গানের কথা আলাদা করে বলি, 'ইয়াদোঁ কি বারাত' ছবিতে একটি দ্বৈতগান আছে কিশোরকুমার আশা ভোঁসলের কণ্ঠে। আউটডোরে পাহাড়ে গানটার picturisation হয়। একটা ইন্টারলিউডে পারাকাসন-এর চারমাত্রার একটা শব্দপ্রয়োগ আর দৃশ্যত নায়কের পা লেগে উঁচু পাহাড় থেকে একটা পাথরখণ্ড গড়িয়ে পড়ায় যে কী অসম্ভব mixture হয়েছে—মনে পড়লে বারবার অবাক হতে হয়। কিংবা ঐ ছবিতেই একটা দ্রুত লয়ের গান, যেখানে একদিকে হোটেলে নাচগান চলছে, অন্যদিকে নায়ক ধর্মেন্দ্র রহস্যময় এক নৈশ অভিযানে এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি, দড়ি বেয়ে হাতে চাকা লাগিয়ে চলে যাচ্ছেন—এই দ্রুতলয়ের intercutting-এ দড়ি বেয়ে যাওয়ার নেপথ্যে যে অনন্য violin'-এর run-আছে—সেটাও ভোলা যাবে না। এরকম কত অসামান্য সংগীতভাবনা এবং প্রয়োগ রাহুলদেবের গানগুলিকে ফিল্মসংগীতের মণিমাণিক্য করে তুলেছে, ভাবলে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে মাথা নত হয়ে আসে।

'পড়োসন' ছবির গান তো নানা দিক থেকেই ইতিহাস। সেই গানগুলিতেও, বিশেষত 'কহনা হ্যায়' গানের মুখড়ার নেপথ্যে যে কর্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট কিংবা মান্না-কিশোর দ্বৈত কণ্ঠে



বাবা-মার সঙ্গে এয়ারপোর্টে

সেই 'এক চতুর নার' গানের অনবদ্য ইন্টারলিউড কমেডি—এসব ভাবলে সত্যি অবাক না হয়ে পারা যায় না। 'আরাধনা' ছবির সুরকার এবং সংগীত পরিচালক ছিলেন শচীনদেব। আর গানের অ্যারেঞ্জার ছিলেন রাহুলদেব। যখন ছবিতে পুত্র রাজেশ পর্দায় আসছে—মা শর্মিলা তাকে দেখে প্রথম রাজেশের কথা ভেবে স্মৃতিভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে। এই সিচুয়েশনে নেপথ্যে রাহুলদেবের কণ্ঠে একটা অদ্ভুত সুর লহরী ছিল হে হে শব্দে। কী অমোঘ সেই সুরবিন্যাস, যা গোটা ছবির মেজাজে বিষন্নতাকে বেঁধে দিয়েছিল খাঁটি শিল্পের স্পর্শে!

সফল গানের জুটি হিসেবে ভাবলে 'রাহুল-আশা'-র চেয়ে 'আশা-ওপি নাইয়ার'-এর নামই আগে মনে আসে। তবে আশার গায়নভঙ্গিমাও নতুনভাবে সঞ্জীবিত হয়েছে, রাহুলের সুরসৌজন্যে। 'পিয়া তু অব তো আজা'—এই গানে আশা ছুঁতে পারলেন শিল্পী জীবনের এক ব্যতিক্রমী সাফল্যকে। Musical এবং Vocal



রাহুল আশা কিশোর



সুনীল দত্ত আনন্দ বক্সী রাহুল



মান্না দে এবং ভূপিন্দর সিংকে ডিরেকসন দিচ্ছেন রাহুল

decoration -এ এই গানটাকে ঝোড়ো হাওয়ার মতো উন্মাদনায় ভরিয়ে তুলেছেন রাহুল। এরকম অসংখ্য পরীক্ষা নিরীক্ষায় আশাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছেন রাহুল।

সিনেমার গানের সংখ্যার তুলনায় রাহুল-সুরারোপিত বেসিক গানের সংখ্যা নিতান্তই কম। কিন্তু সেটা সংখ্যা বিচারেই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা মানগত বিচারে বিশ্লেষণে নয়। সেদিক থেকে দেখলে প্রায় প্রতিটি গানই হয়ে উঠেছে হীরামাণিক। শুরু করেছিলেন লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে। সালটা ১৯৬৫। গানের কথা লিখেছিলেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় —'আমার মালতীলতা' এবং 'আমি বলি তোমায়'। '৬৭-তে গাওয়ালেন কিশোরকুমারকে দিয়ে। কিশোরকুমারের গাওয়া প্রথম বাংলা বেসিক গান 'একদিন পাখি উড়ে যাবে যে আকাশে...' এবং (একাই দ্বৈতভূমিকায়)'বাবা খোকা'। 'আকাশ কেন ডাকে মন ছুটি চায়' ৬৮-তে কিশোরের গাওয়া গানের অসাধারণ মেলডিতে আর উদাসী বিষণ্ণ মাধুর্যে রাহুল জয় করে নিলেন বাঙালি শ্রোতার মন। '৬৮-তেই আশা গাইলেন রাহুলের সুরে--'এই এদিকে এসো' আর 'যাবো কি যাবো না'। এই গান বিরূপ মন্তব্য আর বিদ্রূপের ঝড় তুলল রক্ষণশীল মহলে, কিন্তু সাদর অভ্যর্থনা পেল সাধারণ শ্রোতার। নতুন ধরনের কথায় সুরে ছন্দে উপস্থাপনায় চমকিত হল বাঙালির অভ্যস্ত শ্রবণ। বাংলা সংগীতজগতের শিরোনামে উঠে এলেন রাহুল। সলিল চৌধুরী, নচিকেতা ঘোষ, সুধীন দাশগুপ্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরের আবহ থেকে একেবারে ভিন্ন, সম্পূর্ণ নিজস্ব, বিশিষ্ট একটি বাংলা গানের ধারা শ্রোতাকে উপহার দিলেন রাহুলদেব। এরপর নিজেও এলেন গায়ক হয়ে। সেও এক তোলপাড়। 'মনে পড়ে রুবি রায়' কিংবা 'ফিরে এসো অনুরাধা'--এই ধরনের বাণী বাংলা গানে কে কবে শুনেছে তার আগে? আদ্যন্ত নতুন, ঝকঝকে মেদহীন স্মার্ট শব্দে একেবারে অন্যরকমের বাংলা গান। যন্ত্রসংগীতের অভাবনীয় ব্যবহার, গায়নশৈলীর জাদুকরী সম্মোহন—বাঙালি শ্রোতাকে শ্রবণের নতুন দীক্ষা দিল। নবীন প্রজন্মের কাছে তখন অনিবার্যভাবে বাংলা বেসিক গানেও অন্যতম প্রিয় সুরকারের নাম হয়ে উঠল রাহুল দেববর্মন। এ প্রসঙ্গের শুরুতেই লিখেছিলাম, সংখ্যায় বেশি নয়; কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট আর ট্যালেন্টের যুগলবন্দিতে রাহুল-সুরারোপিত মৌলিক বাংলা গানের সম্ভার চিরস্থায়ী উজ্জ্বলতায় ভাস্বর হয়ে রইল স্মৃতিধার্য গানের তালিকায়।

ছন্দ, সুর, তালবাদ্যের ব্যবহার, স্ক্যানিং —সব

দিক থেকে অভিনবত্ব আর নান্দনিক সৌন্দর্যের প্রতীক যেসব বাংলা গান রাহুলদেব আমাদের দিয়ে গেছেন, তার তালিকা নেহাত ছোট নয়। তারই মধ্যে নিজের ভাললাগা গানের একটা ক্ষুদ্র তালিকা পেশ করি।

ডেকে ডেকে কত—রাহুলদেব
আকাশ কেন ডাকে—কিশোর কুমার
একদিন পাখি উড়ে—ঐ
চোখে চোখে কথা বলো—আশা ভোঁসলে
পোড়া বাঁশি শুনলে—ঐ
আমি বলি তোমায়—লতা মঙ্গেশকর
কথা দিয়ে এলেনা—আশা ভোঁসলে
যেতে দাও আমায় ডেকোনা—ঐ
সন্ধ্যাবেলায় তুমি আমি—ঐ
ময়না বলো তুমি —ঐ
যায়রে যায়রে বেলা—রাহুল-আশা
মহুয়ায় জমেছে আজ—আশা ভোঁসলে
নদীর পাড়ে উঠছে ধোঁয়া—রাহুলদেব
সে তো এল না —কিশোর কুমার।

যাঁরা নতুন কিছু করার নেশায় মেতে উঠতে চান—যাঁরা বাংলা গানের শরীরে জড়াতে চান অভিনবত্বের নিত্য নতুন অলঙ্কার—তাঁরা উল্লেখিত লেখা গানগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শুনে দেখতে পারেন। এসব গানে (এবং আরও অজস্র গানে) রাহুলদেবের সৃজন যে কত বর্ণময়, দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে—আজও তা ভাবলে পুলকিত হই।

বাংলা ছায়াছবির জগতেও রাহুলদেব মনে রাখার মতো কাজ কিছু করে গেছেন। রাজকুমারী, একান্ত আপন, অন্যায় অবিচার—এসব ছবিতে মন-মাতানো বেশ কিছু গান তিনি উপহার দিয়েছেন। আজও তারা অমলিন।

রাগসংগীতে রাহুলদেবের অধিকার ছিল। অধিকার ছিল পাশ্চাত্য সংগীতে। আর নিরন্তর তাঁর যাতায়াত ছিল লোকসংগীতের দেশি বিদেশি আঙিনায়। এই সবকিছুরই অসাধারণ মিশ্রণ এবং প্রয়োগ, গানগুলিকে ভিন্নতর মাধুর্যে ভরিয়ে তুলেছে। এ বড় সহজ কাজ নয়। ইউরোপের প্রয়োগ রীতিকে কোন যাদুতে ভারতীয় কিংবা বাঙালি করে তুলতে হয় কিংবা ভাটিয়ালি অথবা কীর্তনকে কী করে মেশাতে হয় পপ জ্যাজের সঙ্গে—এসব দুরূহ কৌশল ছিল তাঁর বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর অধ্যবসায়ের ফল। যন্ত্রসংগীতে তাঁর দক্ষতা ছিল বিচিত্রগামী।-লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালের সুপারহিট ছবি 'দোস্তি'র অসাধারণ সব গানের প্রিলিউড ইন্টারলিউড মাউথ অর্গ্যানে বাজিয়েছিলেন পঞ্চম। ছন্দোবৈচিত্রে ডুগি'র বিস্ময়কর ব্যবহার তাঁর অভাবনীয় উদ্ভাবনী শক্তিরই পরিচয়। চেনা তালকে অচেনা বিভঙ্গে প্রয়োগের নৈপুণ্যে রাহুলদেব পথিকৃৎ। খুব বড় মাপের অ্যারেঞ্জারও ছিলেন। শচীনকর্তার বহু সুপারহিট গানের দুর্দান্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট রাহুলদেবেরই মস্তিষ্কপ্রসূত।

বড় মাপের স্রষ্টা তিনি ছিলেনই। সেই সঙ্গে তাঁর ছিল অনন্য প্রয়োগভাবনা। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের timber texture তাঁর গানে কী কুশলতায় সুসজ্জিত হয়েছে, ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়। ইলেকট্রনিক সাউন্ড এফেক্টসও তাঁর হাতে অনন্য নজির তৈরি করেছে নানা গানের যন্ত্রানুষঙ্গে।

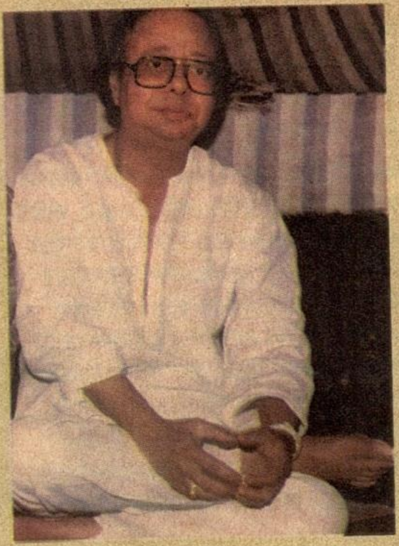
ব্যক্তিগতভাবে আরেকটি বিষয় আমার মনে হয়েছে। রাহুলদেবের বহু গানে রবীন্দ্রপ্রভাব ছিল, কিন্তু অপ্রকটভাবে। শচীনকর্তার বেশ কিছু গানে যেমন সরাসরি রবীন্দ্রসংগীতের সুর নেওয়া হয়েছে, রাহুলদেবের ক্ষেত্রে তেমন কোনও নজির নেই। তবু আপ কি কসম, অমর প্রেম, আঁধি ইত্যাদি ছবিতে কিংবা বেশ কিছু বাংলা বেসিক গানেও রবীন্দ্রসংগীতের নির্মাণ-প্রক্রিয়ার প্রভাব তাঁর মধ্যে কাজ করেছে। অনুকরণ বা অনুসরণও নয়, অনুপ্রেরণার কথা বলছি, যা বহু গানেই বেশ বোঝা যায়।

ব্যক্তি রাহুলদেবের জীবনচর্চার গল্প খুব বেশি জানা নেই। ওঁর কাছের মানুষ যাঁরা, তাঁরা হয়তো নানা কথা জানেন। বলেনও। আমি এটুকু জানি এবং বুঝি, সাজানো গোছানো সুখের সংসারজীবন তাঁর ছিল না। যেটুকু শৃঙ্খলা বা নিয়ম একটা মানুষের প্রাত্যহিকতাকে মায়া মমতায় বেঁধে রাখতে পারে, বোধকরি পুরোমাত্রায় তা জোটেনি রাহুলদেবের ব্যক্তিজীবনে। অন্য অনেক প্রতিভার মতোই রাহুলদেবও এক তুমুল সংক্ষুব্ধ আন্দোলিত উন্মাদনায় ঘেরা সৃষ্টিপাগল মানুষ। জীবন, তাঁর ঝুলি থেকে সংগ্রহ করেছে স্মরণীয় আশ্চর্য সব সৃষ্টির উল্লাস, বিনিময়ে তাঁকে দিয়েছে খ্যাতি যশের পাশাপাশি অনেক হতাশা, ব্যথা, যন্ত্রণা। ব্যতিক্রমী সৃজনী-প্রতিভা রাহুলদেবের জীবনও এক বেনজির ব্যতিক্রম। গানই তাঁর কৈশোরের সবুজ মাঠ, যৌবনের বসন্তবাহার, পরিণত বয়সের ছায়াঘন বিশ্রাম। গানেই তিনি মেতে থাকতে পারতেন। মাতিয়ে দিতে পারতেন। অনাবিল মনের প্রাণখোলা হাসি আর গান পাগল হৃদয়—এই তো রাহুলদেবের আসল বায়োডাটা। যেখানে সুর পঞ্চমে ঝর্ণাধারা ছুটেছে সাফল্য থেকে সার্থকতায়। সার্থকতা থেকে স্থায়িত্বে। স্থায়িত্ব থেকে স্মরণীয়তায়।

হৈ-চৈ হুল্লোড়প্রিয় মানুষ ছিলেন পঞ্চম। ফুটবল পাগল তো ছিলেনই। ইস্টবেঙ্গলের অন্ধ সমর্থকও ছিলেন। বোম্বেতে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের তুমুল সংঘর্ষ, আর গ্যালারিতে রাহুলদেব নেই, এটা প্রায় অসম্ভবই ছিল। খেতে ভালবাসতেন, খাওয়াতেও। শোনা যায়, পাকা রাঁধুনিও ছিলেন। আর সেখানেও নাকি ছিল নিত্যনতুন এক্সপেরিমেন্ট। পান ভোজনে বরাবরই সুরসিক রাহুলদেব।

'কাথায় যেন কী এক উদ্দামতা তাঁর চিন্তায় মননে জীবনযাপনে জাগুরূক থাকত সদা সর্বদা। অদ্ভুত প্রাণচঞ্চলতা! আর তারই নেপথ্যে ছিল বিষাদময় অতল গভীরতা, অসাধারণ কল্পনাশক্তি আর বিচিত্র অন্বেষণী মন।

জীবনের শেষটা আনন্দময় ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গানেও তিনি আদ্যন্ত ছিলেন রাহুল দেববর্মন। ১৯৪২-এ লাভ স্টোরি-তে তিনি আবার আমাদের বিস্ময়ে স্তব্ধ করে দিতে পেরেছিলেন। গানগুলি শেষের বেলার গান বলেই হয়তো রোম্যান্টিকতার সেইসব ফুলে ফুলে কোথায় যেন রয়ে গেছে বিষণ্ণতার অশ্রুশিশিরকণা। প্রতিদিন নতুন আরও নতুন হয়ে ওঠাই যাঁর ব্রত, তাঁর চলে যাওয়ার এতদিন পরেও মনে হয়, আসলে পঞ্চম যেতে পারেননি। রাশি রাশি রঙবাহারি ফুলের মতো অজস্র গান যিনি সাজালেন আমাদের উঠোনজুড়ে—এইসব মায়াময় ঘরবাড়ি ছেড়ে তিনি কি আদৌ যেতে পারেন!....



মনে পড়ে



মায়ের কোলে

আলফানসো আর ক্ষীর—পশ্চিমী দুনিয়ার ডাকসাইটে এই আমের সিম্ফনির সঙ্গে সাবেকি ঘরানার ক্ষীরের আলাপ জমাতে পারতেন বোধহয় একজনই—৩৬/১, সাউথ এন্ড পার্কের টুবলু। ছোটবেলা থেকেই এক্সপেরিমেন্টের দিকে নজর ছিল টুবলুর। দাশগুপ্তদের বাড়িটা ছিল পাশেই, গায়ে গায়ে লাগানো। একবার দাশগুপ্তদের বাড়িতে সরস্বতী পুজো হচ্ছে। পুজো মানেই টুবলু তো সেখানে ভীষণ ব্যস্ত। ভাসানের দিন মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বলল, 'রানা, গাড়িতে বাঁয়া তবলা তোল।' বাঁয়া-তবলার সঙ্গে ভাসানের কী সম্পর্ক আছে সেটা তখনও কারও মাথাতেই আসেনি। ছেলেদের ডেকে টুবলু বোঝাল, 'দ্যাখ, এবার কিন্তু সরস্বতী মাইকি জয়-টা অন্যভাবে বলতে হবে।' যেমন ভাবা তেমনি কাজ। বাঁয়া-তবলার তালে তালে রোল উঠল সর-স্বতী-মাই-কি-জয়-টিক-ঢাক-টিক-ঢাক। তখনও কলকাতায় ফিউসন মিউজিক বা র‍্যাপের চল হয়নি। একদল বছর বারো-তেরোর ছেলেদের ঘিরে তাই ভিড় জমে গেল রাস্তায়।

এরকমই ছিল টুবলু—রাহুল দেববর্মন। রাহুলের ছেলেবেলার অনেকটাই কেটেছে ৩৬/২, সাউথ এন্ড পার্কে—দাশগুপ্তদের যে-বাড়িটা বর্তমানে 'খবর এখন'-এর অফিস, রাহুল দেববর্মনের মামাবাড়ি। সম্পর্কে মামা হলেও অভিজিৎ দাশগুপ্ত রাহুলের চেয়ে বছর কয়েকের ছোটই ছিলেন। রাহুল ডাকতেন 'রানা' বলে। অভিজিতের চোখে এখনও সেই দুপুরগুলো ছবির মতো ভাসে। একবার দুজনে মিলে ঠিক করলেন একজনকে শাস্তি দিতে হবে। আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগটা কিন্তু গুরুতর। একটা লোক রোজ বাড়ির নীচে 'কুকর্ম' করে যায়। সেটা বন্ধ করতে হবে। একদিন দুপুরে তক্কে তক্কে ছিল টুবলু আর রানা। হাতের কাছে তৈরি ছিল এক বালতি সাবান গোলা জল। নিশ্চিন্ত মনে লোকটা কাজ শুরু করতেই ঝপাস! ব্যস্ বন্ধ হয়ে গেল জ্বালাতন।

একবার গুরু দত্ত এসেছেন শচীন দেববর্মনের বাড়িতে। একথা সেকথা চলতে চলতেই খেলা শুরু হয়ে গেল। ঘরের চারকোণে বসে গেলেন চারজন—টুবলু, রানা, শচীনদেব আর গুরু দত্ত। চারটে কাঠের বাস নিয়ে ধাক্কা-ধাক্কির কম্পিটিশন চলল সারা দুপুর। কার বাস কত জোরে ধাক্কা মারতে পারে। তখন কোথায় শচীন দেববর্মন, কোথায় গুরু দত্ত সবাই ছেলেমানুষ।

রাহুলের ছেলেবেলাটা কেটেছে এরকমই একটা হৈ-হৈ করা পরিবেশে। বন্ধুদের নিয়ে হুল্লোড় করতে ভালবাসতেন। একবার সাঁতারের কম্পিটিশন হচ্ছে। আরও দুই বন্ধুর সঙ্গে সাঁট করে নিলেন রাহুল। ঠিক ঠাক হয়ে গেল কে ফ্রি-স্টাইলে ফার্স্ট হবে, কে ব্যাক স্ট্রোকে, কে ব্রেস্ট স্ট্রোকে। একদম গট আপ গেম। আসলে বন্ধুদের নিয়ে হৈ-চৈ করতে, সবাইকে হাসাতে, সবাইকে খুশি রাখতে চাইত টুবলু। একবার স্লো-সাইকেল রেসে সবাই যখন এক জায়গায় সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে কালঘাম ছুটিয়ে দিচ্ছিল তখন বাঁই বাঁই করে পাক মেরে রেস শেষ করে টুবলু চেঁচাতে লাগল 'আমি ফার্স্ট,' আমি ফার্স্ট'। লাস্ট হল; কিন্তু সবাইকে খুশি করার, হাসানোর ওই সুযোগটা ছাড়তে পারল না। কিন্তু যে ছেলেটা এত হাসাতে পারত তার গানে এত ট্র্যাজেডি এল কোথা থেকে? উত্তরটা অভিজিতের কাছেও পরিষ্কার ছিল না সেদিন। 'ওর বিয়েটো.....ইট ওয়াজ নট সাকসেসফুল.........প্রোব্যাবলি দ্যাট।' একবার আমি যখন বম্বে থেকে চলে আসছি, ও খুব পীড়াপীড়ি করছে আমায় রেখে দেবার জন্য, আর আমারও থাকার উপায় নেই। ও বলল, জানিস যতদিন আমার ক্ষমতা আছে ততদিন এই সব লোকগুলো আমার পাশে ঘুরঘুর করবে। তারপর সব শেষ! এই লাইফটা মোটেই ভাল লাগে না। তবু তোরা এলে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। আসলে আত্মীয়-স্বজন নিয়ে থাকতে ভীষণ ভালবাসত। কেমন ছেলেমানুষ হয়ে যেত। একবার পড়োসনের রেকর্ডিং-এর সময় আমি বসেআছি ওর স্টুডিওতে। কিশোরকুমার সোফায় বসে। ও গেয়ে উঠল 'কিশোর মামা গুড়ু গুড়ু হুঁকোয় দিল টান/দাদু-দিদা ডারি ডারি ডিরি ডারি ডাম ডা রো......' এরকমই একটা মজাদার মানুষ ছিল ও ....বাবলিং উইথ লাইফ। ও আসা মানে একটা আনন্দের ঝড়....আর একটা অসাধারণ স্পোর্টসম্যান স্পিরিট।'

খুদে রাহুল





দিদিমার সঙ্গে

সাধারণত যেটাকে ফর্ম্যাল পড়াশোনা বলা হয়, তাতে বিশেষ মন ছিল না রাহুলের। অভিজিৎ দাশগুপ্তর বাবা, মানে রাহুলের মণিদাদু ওদের নিয়ে পড়াতে বসাতেন। প্রায়ই বকুনি খেত টুবলু। একবার প্রোমোশন পায়নি টুবলু। কাঁচুমাচু মুখ



ঘোড়সওয়ার

করে ঢুকল বাড়িতে। অন্য কোন বাবা হলে সেদিন হয়তো উত্তম-মধ্যম জুটত। কিন্তু সে ধাঁচের মানুষ ছিলেন না শচীনদেব। বরং বিকেলে বাড়িতে ঢুকলেন ব্যাডমিন্টন র‌্যাকেট হাতে নিয়ে। সারা বিকেল চলল ব্যাডমিন্টন খেলা।

আর চলত মিউজিক। মাঝে মাঝেই ফিরপোজের নীচে হ্যারিজ মিউজিক থেকে ওয়েস্টার্নের রেকর্ড বগলদাবা করে ঢুকত টুবলু। এলেই রানার ডাক পড়ত-'চলে আয়।' শুধু গান শুনেই শান্তি ছিল না। তারপর শুরু হত টুবলুর প্যারডি। একবার শচীনদেবের একটা রেকর্ডিং-এর সময় স্টুডিওতে হাজির টুবলু আর রানা। পারকাসনিস্ট সেদিন তখনও আসেনি। শচীনদেব ডাক দিলেন 'পঞ্চম'। সেইদিনই প্রথম রেকর্ডিং 'শুধু টাক ডুম টাক ডুম'-এর অরিজিনাল গানটার। মন্দিরা বাজানোর দায়িত্ব দেওয়া হল রাহুলকে।

বম্বে চলে যাবার পর কলকাতায় এলে রাহুল উঠতেন গ্র্যান্ডে। তারপর ফোন করতেন শুক্লাদিকে—রানার মা, রাহুল ডাকতেন 'শুক্লাদি'। ফোন করেই অর্ডার দিতেন এটা এটা রাঁধো, আমি আসছি। তারপর লুকিয়ে, লুকিয়ে চলে আসতেন। আসর জমে যেত। একবার অভিজিৎরা সবাই মিলে গেছেন নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। রাহুলের শো সেদিন। জমে গেছে সেদিন সন্ধেটা। 'পিয়া তু অব তো আ জা' যখন চলছে, রাহুল হঠাৎ গেয়ে উঠলেন, 'মণিদাদু তুমি চলে এসো কফি এসে গেছে'। গোটা স্টেডিয়াম হতবাক। কী হল কেউ বুঝতে পারল না। মণিদাদু বুঝতে পারলেন নাতির কথা। আসলে মণিদাদুকে ছাড়া রাহুলের চলত না। প্রতিটা অ্যালবাম শুনে ফিড ব্যাক দিতে হত। শোলের 'মেহবুবা' গাইবার কোনও পরিকল্পনা ছিল না রাহুলের। মণিদাদুকে এসে শোনালেন, 'কেমন হয়েছে বল তো?' 'ভালোই তো, কে গাইছে গানটা?' জিজ্ঞাসা করলেন মণিদাদু। 'কিশোরদা গাইবে'। 'ওটা তোর গলাতেই রাখ না'। 'আমি করব? ভাল হবে?' মণিদাদুর কথা আবার ফেলতে পারতেন না রাহুল। 'মেহবুবা' রেকর্ড হল রাহুলের গলাতেই।

অভিজিৎ-এর সঙ্গে দেখা হলেই জমত আড্ডা। শচীনদেবও ছিলেন দারুণ আড্ডাবাজ। সব বয়সের বন্ধু। একবার কলকাতায় এসে বাড়িতে না পেয়ে অভিজিৎ-এর নামে চিরকুট রেখে গেলেন-'রানা ভাই রে রানা ভাই। হাততালি দে গান গাই'। একবার বোম্বেতে গেছেন অভিজিৎ, '১৯৪২-আ লাভ স্টোরি'র রেকর্ডিং চলেছে—'এক লড়কিকো দেখা তো অ্যায়সা লগা'। রাহুল সোজাসুজি একটা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, 'দেখিস এই গানটা সুপারহিট হবে, তবে......দূর্ এখন আর রেকর্ডিং করতে ইচ্ছে করছে না। প্যাক আপ'। ব্যস, সারা শহর ঘুরে ঘুরে আড্ডা, খাওয়া, বেড়ানো চলল রাত দুটো অবধি।

'আর একদিন অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে একটা সময় করা ছিল রাহুলের। আমি যেতেই ও ফোন তুলে বলে দিল, আজকে যেতে পারব না। রানা এসেছে। আমি পারব না।' আমি বললাম, 'আচ্ছা রানা কে, সেটা অমিতাভ বচ্চন জানবে কি করে?' ও বলল, কেন জানবে না। জেনে নেবে।'

আড্ডা ছাড়া আর একটা প্যাশন ছিল রাহুলের, খাওয়া। পছন্দের তালিকায় অবশ্য সবই বাঙালি রান্না। পাবদা মাছের ঝোল, তেল কই, বড়ি দিয়ে মোচার ঘন্ট—বড়িটা ছিল মাস্ট। তবে রান্নার এই আবদারটা পুরোটাই চলত শুক্লাদির কাছে। শুক্লাদি যখন বিয়ে হয়ে দাশগুপ্ত পরিবারে এলেন, তখন থেকেই রাহুল তাঁর ন্যাওটা। জানলার গ্রিল দিয়ে পা ঝুলিয়ে মাউথ অর্গান বাজাত যখন, শুক্লাদিকে বসে বসে শুনতে হত। ঝক্কিও পোহাতে হত খুব। ছাদে শুকোতে দেওয়া কাপড়গুলো নিচে ফেলে দিয়ে চুপ করে বসে থাকত টুবলু। যেন ভাজা মাছের পিঠটা উল্টে দিতে হবে। 'ও খুব সাহসী ছিল জানো', বললেন অভিজিৎ দাশগুপ্তর মা, টুবলুর শুক্লাদি। 'একবার গোপালপুরে বেড়াতে গিয়ে একটা সাপ ওর পায়ে জড়িয়ে গিয়েছিল। ও করল কি, কায়দা করে সাপের মাথাটা হতের মুঠোয় ধরে চেঁচাতে শুরু করল। শিগগির এসো সাপ ধরেছি, ছবি তোলো এক্ষুণি। আসলে রাহুলের উপস্থিতিটা এখনও এই বাড়ির সর্বত্র জড়িয়ে রয়েছে। মারা যাবার কদিন আগে ও আমাকে ফোন করল। বলল, বম্বে চলে এসো। আমাদের তখন দল বেঁধে তিরুপতি যাবার কথা। আমি বললাম কি করে যাব আমাদের তো টিকিট কাটা হয়ে গেছে। ও বলল, আমি বম্বে থেকে তোমার যাবার ব্যবস্থা করে দেব। সেবার আর বম্বে যাওয়া হয়নি।

সাঁতারুর দলে





গ্রুপ লিডার

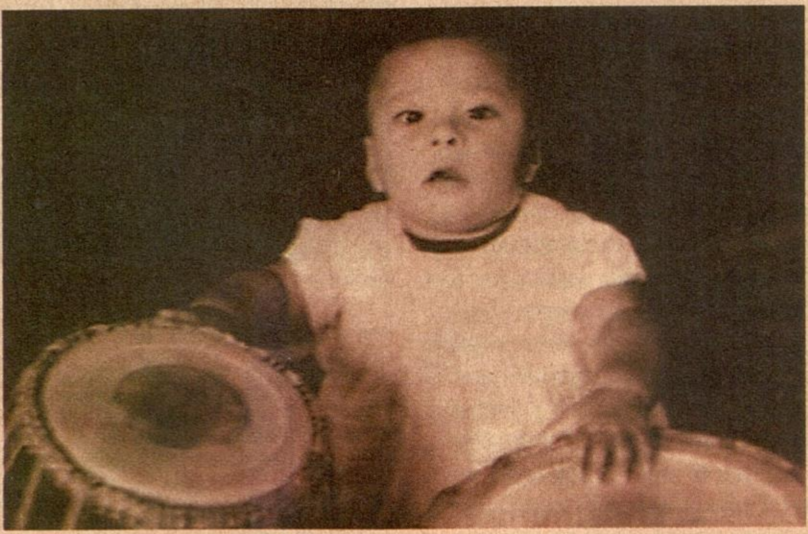
ওই ফোনটাই শেষ কথা ছিল রাহুলের সঙ্গে শুক্লাদির। রাহুলের মৃত্যুর খবরটা পেয়ে দুদিন কথা বলতে পারেননি মণিদাদু। অভিজিৎকে তটস্থ থাকতে হয়েছিল বাবার শরীর নিয়ে। আর শুক্লাদি! কথা যখন শেষ হল শুক্লাদির চোখের কোণে চিকচিকে জলের ফোঁটা, চশমার কাঁচের এপার থেকে আরও বড় দেখাচ্ছিল।

রোহিত খান্না

ছবি অভিজিৎ দাশগুপ্তর সৌজন্যে



অভিজিৎ ও শুক্লা দাশগুপ্ত



ব্রজেন বিশ্বাস বললেন

টুবলুকে কর্তা যখন আমার হাতে দিলেন, তখন ওর বয়স এই তেরো-চোদ্দ। পড়াশুনায় মন ছিল না বলে ওকে নিয়ে ওর মার খুব চিন্তা ছিল। কিন্তু কর্তা বুঝেছিলেন, পড়াশুনায় মন না থাকলেও গানবাজনায় টুবলুর দারুণ আগ্রহ আছে। আর ও মন থেকে ভালবাসে বলেই কিছু করতে চাইলে এই লাইনেই করতে পারবে।

শিক্ষক হিসাবে বলি—আমার এই চুরাশি বছরের জীবনে আমি ছন্দের এইরকম বোধ, হাতের এইরকম কাজ টুবলুর মতো আর কারও পাইনি। এত কঠিন ছন্দ, এমন বোল ও খেলাচ্ছলে বাজিয়ে দিত, যে, ওকে আমার ঈশ্বর বলে মনে হত কখনও কখনও। আর যে-কোন যন্ত্র বাজাবার একটা অসাধারণ ক্ষমতা ওর ছিল।

টুবলুকে কলকাতায় রেখে ওর বাবা-মা গেলেন বম্বে। এখানে ওর দিদিমা ওকে দেখাশোনা করতেন। আর যাওয়ার আগে কর্তা বললেন, 'ব্রজেন, ছেলেটাকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। পারো তো মানুষ কোরো।' কতদূর কী করতে পেরেছিলাম, টুবলুকে শিক্ষক হিসেবে কী দিতে পেরেছিলাম জানিনা, তবে কর্তা একবার এসে ওকে দেখে খুব খুশি হয়ে আমার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, 'তোমাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করি। সৎসঙ্গে মানুষের কী হয়, পঞ্চমকে দেখে আমি বুঝতে পারছি। আর আমার দুশ্চিন্তা নেই।' টুবলু আমার সঙ্গে সঙ্গে সব ফাংশানে যেত। বলত, 'দাদা তোমাকে যদি কেউ কখনও কিছু বলে, অপমান করে, আমি তাকে একেবারে শেষ করে ফেলব। তোমার গায়ে একটু আঁচড়ও লাগতে দেব না।'—গানবাজনার জগতে নানারকম দলাদলি রেষারেষি তো চিরকালই ছিল, সেজন্যই এরকম বলত টুবলু। আসলে আমাকে বড় বেশি ভালবাসত। নাম করার পরও আমার কাছে টুবলু, সেই টুবলুই থেকে গেছে। আর ওর কাছে আমি 'দাদা'। যখনই কলকাতায় এসেছে, দেখা করে গেছে। আমার ছেলে বাবলু (ঈশান)'৮৮-তে গেল বোম্বেতে। ও যাতে কাজ করতে পারে, তার জন্য যতরকম সহযোগিতা করা সম্ভব, ঠিক বড় ভাইয়ের মতো টুবলু তা করেছে। ওর মনটা এত বড় ছিল, আর এমন ক্ষমতা ঈশ্বর ওকে দিয়েছিলেন, যা সত্যিই দুর্লভ। বড় বেহিসাবী হয়ে জীবনটা শেষ করে দিল—এটাই দুঃখ। ভাবলে বুকটার মধ্যে বড় কষ্ট হয়।



অনেকেই প্রশ্ন করে আমাকে, কে বেশি প্রতিভাবান, কর্তা না টুবলু?—আমি বলি, কর্তা সমুদ্র—তার দিশা পাওয়া ভার। আর টুবলু চেনে সমুদ্রের মানিক। ওর মতো জহুরী কি সহজে মেলে!

বন্ধু আর ডি বি

'শান' ছবির কার চেজিং-এর সেই সিকোয়েন্সটা মনে আছে? প্রতিটা বাঁক ঘুরছে গাড়ি আর পরতে পরতে সুর চড়ছে। একটা স্কেল থেকে আরেকটা স্কেলে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠেছে টেম্পো। আর একদমে পুরো সুরটা ধরে রেখে সিকোয়েন্সের টেনশনটা টান টান করে রেখেছিল ব্যাকগ্রাউন্ড ভয়েস। রাহুল জানতেন ওই কাজটা একজনই করতে পারেন—উষা উত্থুপ। 'লুনিক'-এ পরিচয়ের সময় থেকেই রাহুল বেছে নিয়েছিলেন উষাকে।

বম্বের লিঙ্কিং রোডে ছোট একটা রেস্টুর‍্যান্টে তখন গান গাইতেন উষা। একদিন গান শেষ হওয়ার পর এক শ্রোতা সটান উঠে এসে বললেন 'হাই! আই অ্যাম আর ডি বর্মন'। তখন মিডিয়ার এত রমরমা ছিল না। তাই প্রথমটায় উষাও চিনতে পারেননি রাহুলকে। তারপর নিজের পরিচয় দিলেন। সেই শুরু। এর পরের ধাপই ছিল 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ'র রেকর্ডিং। আসলে ওই ছবিতে 'দম মারো দম' জিনাতের লিপে গাইবার কথা ছিল উষার। সেই অনুযায়ী রিহার্সালও চলছিল। শেষ পর্যন্ত উষার গলায় সেটা আর রইল না। কিন্তু হাল ছাড়েননি উষা। আসলে রাহুলের geniosity চুম্বকের মত টানত উষাকে। সেই আকর্ষণ পরিণতি পায় শ্রদ্ধামিশ্রিত গভীর বন্ধুত্বে।

ওয়েস্টার্ন মিউজিকে উষার দখলটা কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন রাহুল। ঘন্টার পর ঘন্টা বসে দুজনে গান শুনতেন। কখনও রেকর্ড চলত, কখনও উষা গিটার বাজিয়ে নিজেই গেয়ে শোনাতেন। 'বম্বে টু গোয়া' ছবির কাজ শুরু করার সময় রাহুল সাজেশন চাইলেন উষার কাছে। 'দর্দ কা রিশতা' ছবিতেও জ্যাজের ওপর উষার দখল কাজে লাগালেন রাহুল। হ্যারি বেলাফন্টের একটা অ্যালবাম উষা শুনতে দিয়েছিলেন রাহুলকে—'মার্সি বন্দে'। গানটা খুব পছন্দ হয়ে গেল রাহুলের। ইমপ্রোভাইজ করলেন গানের শুরুর টেম্পো মাথায় রেখে। সুর করলেন 'ধন্নো কি আঁখো মে'। একবার দুজনে বসে শুনছিলেন 'ইফ ইটস টুইসডে ইট মাস্টবি বেলজিয়াম....' রাহুল বলে উঠলেন



ইয়ার ইসকা কুছ করতে হ্যাঁয়, অ্যান্ড হি মেড চুরা লিয়া হ্যায় তুমনে জো দিল কো, হোয়াট আ ফ্যাবুলাস সঙ ইট ওয়াজ!' স্মৃতির উদ্ভাসে উচ্ছ্বসিত উষা।

কেমন ছিলেন রাহুল স্টুডিওর ফ্লোরে? 'হি ওয়াজ রেসপেক্টেড অ্যান্ড লাভড বাই অল। বাট হি মেনটেনড্ দ্য ডিসট্যান্স। ইতনা, বস ইসকে বাদ ঔর নহী'। আসলে রাহুল জানতেন কাজ করতে গেলে কতটা ছাড়তে হবে, আর কোথায় দাঁড়ি টানতে হবে। অনেক সময় কাছে আসতে গিয়ে একটা রেখা পার করে যেতে চান অনেকেই। রাহুল কখনও সেটা অ্যালাও করেননি। কিন্তু তার জন্য কখনও মিউজিশি-য়ানরা নিজেদের অনেক দূরে ভাবার সুযোগ পাননি। রাহুল সবার কাছে জানতে চাইতেন পছন্দ-অপছন্দ, কোথায় ইমপ্রোভাইজ করা যায়। সেই সঙ্গে গাইড হিসেবেও 'রাহুল ওয়াজ ফ্যাবুলাস'। শিল্পীর ভিতর থেকে খাদ ছাড়িয়ে সোনাটুকু কিভাবে তুলে আনতে হয়, জানতেন রাহুল। ছোট ছোট টিপস দিতেন, একবার 'প্রেমে পড়ে যাই'-এর রেকর্ডিং এর সময় রাহুল হঠাৎ কাজ বন্ধ করে দিলেন-'উষা, ইয়ার তেরেকো ক্যায়া হো গয়া। আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ টু সাউন্ড লাইক হিন্দি-বেংগলি সিঙ্গার। ইট শুড বি উষা উত্থুপ। আমি ভাবছিলাম আমার গাইবার ধরনে আর ডি খুশি হবে, বাট হি ওয়ান্টেড মি অ্যাজ মি। ইট ওয়াজ সাচ অ্যামেজিং.........' উষা মোটেই অখুশি হননি। বরং রেকর্ডিং-এর পর মাঝে মাঝেই জানতে চাইতেন 'পঞ্চমদা ঠিক আছে তো?' একবার একটা বাংলা গানের রেকর্ডিং চলছে 'মানো, মানো না। কানে কানে গানে গানে.....'। মাঝরাস্তায় গানের কথা বদল করা হল। নতুন কথায় নজর দিতে গিয়ে বার বার সুর থেকে উষার মন সরে যাচ্ছিল। রাহুল বলে উঠলেন, উষা দ্যাট ওয়াজ ফ্ল্যাট, ইট ইজ টেরিবল। উনি জানতেন ওটা সহ্য করার ক্ষমতা আমার ছিল।'

রাহুল বলেছিলেন 'উষা, ইয়ার দেখনা, নাইনটি ফোর ইজ গোয়িং টু বি আওয়ার ইয়ার, মাই ইয়ার'। সে বছরই রাহুল মারা গেলেন। ১৯৪২ আ লাভ স্টোরির পর রাহুলের সুরে বাংলায় শেষ অ্যালবাম 'বাতি নেই, বাতি নেই/ কলকাতাতে বাতি নেই' সুপারহিট হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি আজও রিমিক্স আর্টিস্টরা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন রাহুলকেই। 'হি ওয়াজ ওয়েল বিফোর হিজ টাইম'। রাহুল নেই এই কথাটা মেনে নিতে হয়েছে উষাকে, যেমন মেনে নিতে হয়েছে জীবনের অনেক অপূর্ণতাকে।

বম্বের নেহেরু স্টেডিয়ামে সেদিন কনসার্ট চলছে। গাইতে গাইতে উষার চোখে পড়ল সামনের সারিতে বসে রাহুল। 'আ জা, আ জা, মেরি জাঁ-র শেষ কলিটার তখনও রেশ কাটেনি, দাঁড়িয়ে পড়লেন রাহুল। হাততালিটা প্রথম এল তাঁর কাছে থেকেই, তারপর গোটা স্টেডিয়াম সঙ্গ নিল। আসলে কিছু গান ছিল, যেগুলো ফুটত উষার গলাতেই। 'দেয়ার ওয়াজ ওয়ান আসপেক্ট হুইচ হি উড সে, ইয়ার ওনলি ইউ ক্যান ডু ইট। আই উইশ আই কুড হ্যাভ ওয়ার্কড মোর উইথ হিম।'

আঠারই ডিসেম্বরের সন্ধে। বম্বেতে একটা জন্মদিনের পার্টিতে রাহুল হাজির। সেদিন রাহুল যেন কেমন অন্য মানুষ। মদ ছুঁলেন না, সিগারেটও না। তারপরই রাহুলের কেরালা যাবার কথা। এটা সেটা কথা হল। সেদিনটাই শেষ দেখা। (এমনিতে সপ্রতিভ হলেও কথা বলতে বলতে এখানেই একটু বেশিক্ষণ থামলেন উষা) কারণ, কেরালায় রাহুলের অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পরে উষারা পারফর্ম করেছিলেন, দেখা হয়নি আর!!

রোহিত খান্না

ছবি ঃ শান্তনু চক্রবর্তী





গল্প হলেও সত্যি

রাহুল দেববর্মনের সৃষ্টিকে ঘিরে গল্পের শেষ নেই। রাহুল হিন্দি ছবির জগতে আসেন ১৯৬১ সালে। কিভাবে এলেন? সে-ও তো এক গল্প। অভিনেতা মেহমুদ তখন 'ছোটে নবাব' তৈরির কথা চিন্তা করছেন। মনে মনে ইচ্ছে, শচীনদেব বর্মনকে সংগীত-পরিচালক হিসেবে নেবেন। মেহমুদ তো আর্জি নিয়ে গেলেন শচীনদেব বর্মনের কাছে। কিন্তু শচীনকর্তা কিছুতেই সংগীত-পরিচালকের দায়িত্ব নিতে রাজি হলেন না। তখন মেহমুদ কি করেন! শেষ পর্যন্ত, যে কাগজটাতে 'S.D. Burman' লিখে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে 'S' কেটে দিয়ে লিখে দিলেন 'R'। বললেন, 'এই হয়ে গেল আমার ছবির মিউজিক ডিরেক্টর—রাহুল দেববর্মন!' ১৯৬১ সালে 'ছোটে নবাব' মুক্তি পাওয়ার বছর তিনেক আগেই অবশ্য আর.ডি-র নাম সংগীত-পরিচালক হিসেবে চলচ্চিত্র জগতে এসে যেতে পারত। গুরু দত্ত 'রাজ' নামে একটা ছবি তৈরি করছিলেন '৫৮/'৫৯ নাগাদ এবং সেই ছবির সংগীত-পরিচালক হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন রাহুলকেই। কিন্তু ঐ 'রাজ' ছবির কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পরবর্তীকালে ঐ একই কাহিনী নিয়ে রাজ খোসলা ছবি তৈরি করেন 'ওহ্ কৌন থী?' এই ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন মদনমোহন।

রাহুল দেববর্মনের কথা বলতে গেলে 'তিসরী মঞ্জিল' ছবির গানের কথা বলতেই হবে। 'তিসরী মঞ্জিল' ছবিতে মহম্মদ রফি এবং আশা ভোঁসলে-র দ্বৈতকণ্ঠে গাওয়া 'ও হসীনা জুলফোঁওয়ালী' গানটা ছিল ওয়ান টেক ওকে। রেকর্ডিং-এ উপস্থিত থাকা আর.ডি.-র ভাব-গুরু জয়কিষণ গানটা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান। 'তিসরী মঞ্জিল' ছবিরই আরও একটা সুপারহিট গান 'আজা, আজা ম্যায় হুঁ পেয়ার তেবা'—আশা এবং রফির ডুয়েট গান। গানটার সুর শুনে আশা প্রথমে কেমন যেন হকচকিয়ে যান। তাঁকে বিব্রত হতে দেখে রাহুল জিজ্ঞাসা করেন, 'কঠিন লাগছে? সুরটা কি পাল্টে দেব?' আশা বলেন, 'চেষ্টা করছি। এখনই রেকর্ডিং-এর দিন ঠিক না করাই ভাল।' এর পর দিন-রাত এক করে আশা চেষ্টা করতে লাগলেন। এরই মাঝে একদিন তাঁর দেখা হল লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে। আশা বললেন, 'দিদি, আমি ভাবছি এই গানটা গাওয়া ঠিক হবে কি না! যদি ঠিক করে গাইতে না পারি?' দিদি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে গেলেন দেওয়ালে টাঙানো পিতা দীননাথ মঙ্গেশকরের ছবির সামনে। বললেন, 'পারবে না মানে? পারতে তোমাকে হবেই। এমন কোন গান হয় যা মঙ্গেশকররা গাইতে পারে না?' এর পর আশা রফি সাহেবের সঙ্গে রেকর্ড করেছিলেন 'আজা আজা...।' বাকিটা তো ইতিহাস।

১৯৬৭ সালের ছবি 'বাহারোঁ কে সপনে'-এর গান এখনও সকলের মুখে মুখে ফেরে—'চুনরি সমহাল গোরী/উড়ি চলি যায় রে'। মান্না দে এবং লতা মঙ্গেশকরের দ্বৈতকণ্ঠে গাওয়া অন্যতম হিট গান। রাহুলদেব এই গানের সুরটা তৈরি করার পর শুনিয়েছিলেন শচীন দেব-বর্মনকে। কর্তার পরামর্শ ছিল, গানের মুখড়া যখন ফিরে আসবে তখন যেন লতার গলায় ছোট একটা 'জার্ক' দেওয়া হয় অর্থাৎ 'চুনরি সমহাল —হা-আ/উড়ি চলি যায় —হা-আ। পিতার পরামর্শ শিরোধার্য করেছিলেন রাহুল। আর তার ফল?—পঁচিশ বছর পরের শ্রোতারাই বলুন!

সত্তর দশক—রাহুল দেববর্মনের রাজত্বকাল। 'ইয়াদোঁ কি বারাত' ছবির কথা মনে পড়ে? গানগুলো তো সকলেরই মনে আছে। 'ইয়াদোঁ কি বারাত', এবং 'ববি' প্রায় একই সময়ে মুক্তি পায়। 'ববি'-র ধাক্কায় অন্য পাঁচটা ছবির মতো 'ইয়াদোঁ কি বারাত' প্রথম সপ্তাহে কুপোকাৎ হয়ে গিয়েছিল। এরপর কি হল? ছবিটাতে আরও একটা গান যোগ করা হল। তারপর, কেমন করে যেন রাতারাতি 'ইয়াদোঁ কি বারাত' সুপার-ডুপার হিট হয়ে গেল। সেই বাড়তি গানটা কী ছিল? কিশোর কুমার এবং আঁশা ভোঁসলের ডুয়েট 'ও মেরী সোনী'—আর.ডি.-র সুরে গানটা সেবার canter করে দিয়েছিল।

'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' তো প্রায় সকলেই দেখেছেন। 'নবকেতন'-এর ব্যানারে এটাই ছিল আর.ডি.-র প্রথম ছবি। সেই সময়ে ঐ ছবির একটা গানকে ঘিরে গল্প শোনা যেত। ছবির মিউজিকের কাজ চলাকালীন একদিন বেশ রাত করে রাহুল বাড়ি ফিরে ঘুমিয়েছেন। হঠাৎ মাঝ রাতে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। কী ব্যাপার? স্বপ্নে সুর পাওয়া গেছে। তৎক্ষণাৎ নেমে এলেন নীচে মিউজিক রুম-এ। সুরটা রেকর্ড করে রাখলেন। পরদিন ফিল্ম সেন্টারের রিহার্সাল-রুমে সেই সুর দেবানন্দকে শোনাতেই তাঁর মনে ধরে গেল। গীতিকার আনন্দ বক্সী কথা বসালেন। গানটা রেকর্ড হয়ে গেল। ভাবছেন তো কোন্ গান? অলটাইম হিট 'কাঞ্ছীরে কাঞ্ছীরে'।

একদিন গুলজার একটা গান নিয়ে এলেন রাহুলের কাছে। বললেন, 'এই গানটা ইজাজৎ ছবিতে ব্যবহার করলে ভাল হয়।' আর.ডি. লেখাটা দেখেই ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। বললেন, 'আমি নিউজ-পেপারের হেড লাইনে সুর করিনা।' বলেছিলেন বটে, তবে, সুরও করেছিলেন। সেই গানই 'মেরা কুছ সামান'।

১৯৬৫ সালে রাহুলদেব প্রথম বার বাংলা গানে সুর করেন। বাংলা গানের জগতে তাঁর আসাটাও রীতিমতো গল্প। গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় সাধ, শচীনদেব তাঁর কথায় সুর দিন। এক বুক ইচ্ছে নিয়ে দেখা করলেন শচীনদেবের সঙ্গে, বিখ্যাত রেকর্ডের দোকান মেলডি-তে। শচীনদেব কলকাতায় এলে ওখানেই আড্ডা জমাতেন। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয়ের পর শচীনদেব তাঁকে বললেন, বম্বেতে গিয়ে দেখা করতে। সেই কথামতো পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় গান লিখে নিয়ে তো বম্বে গেছেন। গান দেখে শচীনকর্তা তাঁকে বললেন, 'তুমি এই গান পঞ্চমকে দাও'। এরপর রাহুলের সঙ্গেই তাঁর কথাবার্তা এগোল। যথাসময়ে রাহুল কলকাতায় এলেন। এসে জানালেন, গান তৈরি হয়ে গেলে লতা মঙ্গেশকর রেকর্ড করবেন। এরপর রাহুল এবং পুলকবাবু একসঙ্গে বসলেন। রাহুল আট রকম সুর শোনালেন। শেষ পর্যন্ত যে দুটি সুর নির্বাচিত হল তা নিয়ে বম্বে ফিরে রাহুল লতাকে দিয়ে রেকর্ড করালেন। রাহুলের সুরে প্রথম বাংলা বেসিক গান তৈরি হল। ৭৮ আর.পি.এম. রেকর্ডের এক দিকে ছিল 'আমার মালতী লতা' এবং অন্যদিকে 'আমি বলি তোমায় দূরে থাকো।'

১৯৬৮ সালের ঘটনা। সেবার ঠিক হয়েছিল, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার গান লিখবেন, আর.ডি. সুর করবেন এবং আঁশা ভোঁসলে রেকর্ড করবেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার গান লিখতে বম্বে যাবেন। কিন্তু কাজের চাপে কিছুতেই তার আর বম্বে যাওয়া হয়ে উঠছে না। একটার পর একটা 'ডেট' বাতিল-ই হচ্ছে। অগত্যা কলকাতায় গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে ফোন করে নিজের তৈরি সুর শোনালেন রাহুল। আর ঐ ফোনেই গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার কথা বসালেন, 'যাবো কি যাবো না ভেবে ভেবে হায় রে যাওয়া তো হল না।'

একবার শচীন ভৌমিককে দিয়ে গান লেখাতে উঠে পড়ে লাগলেন রাহুলদেব। শচীন ভৌমিকও বাংলা গান লিখবেন না, ওদিকে রাহুলও নাছোড়বান্দা। টানাপোড়েন চলতে চলতে শচীন ভৌমিক হার মানলেন। রাজি হলেন গান লিখতে। দক্ষিণ কলকাতার কোনও এক বিখ্যাত কলেজের সুন্দরী ছাত্রী ছবি রায়ের প্রতি শচীন ভৌমিকের প্রচন্ড দুর্বলতা ছিল। কিন্তু তেমন সুবিধে করে উঠতে পারেননি। তাঁকে নিয়েই লিখলেন গান, শুধু বদলে দিলেন নামটা। গানটা তৈরি হয়েছিল ১৯৬৯-এ। কিন্তু ২০০২-এ এসেও ভোলার উপায় আছে 'রুবি রায়কে'?

'রুবি রায়' গানটি সম্পর্কে শোনা যায়, রাহুল নাকি গানটা কিশোর কুমারের জন্য তৈরি করেছিলেন। কিন্তু কিশোরের পছন্দ হল না। তখন রাহুল নিজেই গাইলেন গানটা। কিশোরকুমারের জন্য বরাদ্দ গান রাহুল গাইলেন। তবে কিশোর কী গাইবেন? মুকুল দত্তকে দিয়ে লেখানো হল গান—'চলেছি একা' এবং 'সে তো এল না'। ১৯৬৯-তে প্রকাশিত হল আর.ডি.-র সুরে কিশোর কুমারের গাওয়া তৃতীয় তথা সর্বশেষ বাংলা বেসিক রেকর্ড।

এবার এক এবং অদ্বিতীয় 'শোলে'-র কথায় আসি। 'শোলে'-র পরিচালক রমেশ সিপ্পির সঙ্গে রাহুল আলোচনায় বসতেন খার-এর 'ওডেনা বিল্ডিং'-এ। রাহুল সংক্ষেপে 'শোলে'র কাহিনী শুনতেন, কিন্তু গানের সিচুয়েশনগুলো বিস্তারিতভাবে জানতে চাইতেন। শোলের কাহিনীকার সেলিম-জাভেদ জুটির জাভেদ আখতার রাহুলকে শোলের গল্প শোনাতেন আর রমেশ সিপ্পি গানের প্রসঙ্গে কথা বলতেন। মাত্র দুটো 'সিটিং'-এ তৈরি হয়েছিল 'কোঈ হসীনা জব রুঠ জাতী হ্যায়'। এই গানটাই ছিল 'শোলে'র জন্য তৈরি প্রথম গান।

'শোলে' ছবিতেই আরেকটি কান্ড করেছিলেন রাহুল। এই ছবির একটি অদ্ভুত আবহের কথা মনে পড়ে? যখনই গব্বর সিং-এর ডেরাটি দেখা যাচ্ছিল পর্দায়, তখনই রক্ত হিম করা অদ্ভুত একটা 'আঁ-ই-ই-ই' আওয়াজ দর্শকরা শুনতে পাচ্ছিলেন। কিভাবে রাহুলদেব আওয়াজের সৃষ্টি করেছিলেন জানেন? একটা কলসিতে দুটো ফুটো করেছিলেন। একটা বড়, আরেকটা ছোট। তারপর একটা নল দিয়ে জল ঢুকিয়েছিলেন বড় ফুটোয় এবং সেটা বের করেছিলেন ছোট ফুটো দিয়ে—তাতেই তৈরি হয়েছিল ঐ আওয়াজটা!

'খুশবু' ছবিতেও এমনই অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড! একটা বোতলের ছিপি আটকে এবং খুলে তৈরি করেছিলেন 'ও মাঝি রে' গানটির আবহ। ভাবা যায়!

একটা সময় ছিল যখন শচীনকর্তা ভোরবেলা বেড়াতে বেরোলে লোকে বলত, 'ঐ দ্যাখ, শচীন দেববর্মন যাচ্ছেন।' এই ব্যাপারটাতেই অভ্যস্ত ছিলেন বড়কর্তা। কিন্তু ১৯৭৩-এর এক ভোরবেলায় অন্য কথা শুনলেন তিনি। 'ঐ দ্যাখ, আর.ডি.বর্মনের বাবা যাচ্ছেন।' বাড়ি এসেই খোঁজ করলেন, 'টুবলুর কী গান বাইরাইসে রে? লোকে আমারে অর বাপ বইল্যা পরিচয় দিতাছে?' তারপর শুনলেন 'হীরা-পান্না' ছবির গান—'বহুত দূর মুঝে চলে জানা হ্যায়।' শুনে তো মুগ্ধ কর্তা। বললেন, 'নাঃ, লোকে ঠিকই কইতাসে। আমি ভাবছিলাম পোলাডার কিছু হইব না। শঙ্কর জয়কিষণের নকল কইর‍্যাই অর চলব। কিন্তু অখন দেখি সব্বাইরে টেক্কা মারছে!'

বলিহারি আমাদের! মানে, শ্রোতাদের মেজাজ-

সত্য সেলুকাস! কী বিচিত্র শ্রোতারা!



-মর্জির। আমাদের ভাল লাগা, মন্দ লাগা, গ্রহণ-বর্জন সম্পর্কে সাক্ষাৎ মহেশ্বরও কোনও হদিস দিতে পারবেন না। কে কখন আমাদের কাছে গ্রহনীয় হয়ে ওঠেন, কে কখন ব্রাত্য হন, আমরা নিজেরাই জানি না। ১৯৭৬-এ 'মেহবুবা'-র পর থেকে আর.ডি. একটু একটু করে তাঁর জায়গা হারিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর খারাপ সময়েও কিছু কিছু ছবিতে এমন কিছু গান করেছিলেন, যা তাঁর স্বর্ণযুগের গানের সঙ্গে সহজেই তুলনীয়। ১৯৭৭ এর ছবি 'চাঁদি সোনা'। 'চাঁদি সোনা'-র গান তখন শ্রোতারা সটান বাতিল করেছিলেন। কিন্তু ঐ ছবিতে অসাধারণ সুর করেছিলেন রাহুল। একটা ব্যক্তিগত ঘটনার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হচ্ছে। একদিন উত্তর কোলকাতায় রেকর্ড সংগ্রাহক এক বন্ধুর বাড়িতে আড্ডা দিচ্ছি। এমন সময় সিঁথি থেকে গানপাগল বন্ধু অরিজিৎ-এর ফোন এল—'আমি কিশোর কুমারের একটা ক্যাসেট কিনেছি। ওতে আর.ডি-র সুরে 'চাঁদি সোনা' ছবির একটা গান আছে।'সোচা থা ম্যায়নে তো এ্যায় জান মেরী'—গানটা শোনার পর থেকে আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না!!' তাহলেই দেখুন, চব্বিশ-পঁচিশ বছর পরেও যে গান এই প্রজন্মের একজনকে এভাবে মুগ্ধ করে, সেই গানকে রাহুলের নিজের সময়ে ব্রাত্য হতে হয়েছিল। 'চাঁদি সোনা' ছবিটাতে শুধু ঐ একটাই নয় আরও দুটো দুর্দান্ত গান ছিল,—'আপ সা কোঈ হসীঁ' এবং 'উলঝন হজার কোঈ ডালে'। 'উলঝন হজার কোঈ ডালে' এখনকার যে কোনও সুরকারের কয়েক 'জিন্দেগী'-র স্বপ্ন হতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এটাই যে, আজও এই গান 'ফ্লপ'-এর তালিকাতেই আছে। ১৯৮০ সা[illegible]
মুক্তি পেয়েছিল 'রেড রোজ'। ঐ ছবিতে দুটো দুর্দান্ত গান ছিল—'তে[illegible]
বিন জিনা কেয়া' এবং 'কিসকি সাদায়েঁ'। এই গান কেন শ্রোতারা ত[illegible]
নেননি তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। রাহুলের প্রয়াণের পরের ছবিটা বি[illegible]
আরও বিস্ময়কর। অকস্মাৎ তাঁর একদা সুপারফ্লপ গানগুলোর চাহি[illegible]
হু হু করে বেড়ে গেল। আজ 'হরজাই', 'সীতমগর', 'চাঁদি সোনা'-ছ[illegible]
গানের গগনচুম্বী চাহিদা। ১৯৬৯-এর সুপার ফ্লপ 'চন্দন কা পালনা'
রেকর্ড হাতে করে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য কেউ কেউ 'ব্ল্যাঙ্ক চেক
পর্যন্ত নিয়ে তৈরি আছেন। 'আনন্দ অউর আনন্দ', 'ভীমা' কিংবা 'জ[illegible]
আসমান'-এর একটা রেকর্ড দেখতে পেলেই হল। কাড়াকাড়ি শুরু
ক্রেতাদের মধ্যে—কে আগে ঐ রেকর্ড হাতে পাবেন! রাহুল জানতে
পারেননি যে তাঁর এত ভক্ত, এত চাহিদা! তিনি দেখে যাননি 'কৌন[illegible]
ক্যায়সে' ছবির একটা রেকর্ড পাওয়ার জন্য মাস খানেক না খেয়ে
থাকার ক্রেতা আছেন। সত্য সেলুকাস! কী বিচিত্র শ্রোতারা! তবে শ্রো[illegible]
কিংবা ক্রেতার এই মারাত্মক উন্মাদনা এ কথাটা প্রমাণ করে, সত্তরে[illegible]
মাঝপর্বের সূর্যাস্ত ঠিক সূর্যাস্ত ছিল না। ওটা আমাদের দৃষ্টিভ্রম। আজ
রাহুল মধ্যগগনের সূর্য। অন্যসব চাঁদের আলো—সূর্যের থেকেই ধার
করা।

সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত / সোহিনী সেনগু[illegible]

বলিউডের দিনগুলি

গোড়ার কথা



পঞ্চাশের দশক থেকে হিন্দি ছবির গানের চালচিত্রে একটা বড়-রকমের রদবদল ঘটে গিয়েছিল। জনপ্রিয়তার ফটা তখন ক্রমশ উর্ধ্বমুখী। অথচ তার বছর শেক আগেও চিত্রটা এমন ছিল না! তাহলে ভাবে সম্ভব হল ব্যাপারটা? আসলে, সাধারণ নুষকে আকর্ষণ করেছিল মূলত হিন্দি গানের র। ছায়াছবির বিভিন্ন সিকোয়েন্সের সঙ্গে মঞ্জস্য রেখে আগে যে ধরনের কথায় গান লখা হত, এই সময় তার বিশেষ রকমফের য়মি। কিন্তু অসাধারণ সুরসৃষ্টি করতে সক্ষম য়েছিলেন কয়েকজন সুরকার। হিন্দি ছবির াফল্যের ক্ষেত্রে গানের এবং সেইসঙ্গে ছবির ংগীত পরিচালকের ভূমিকা পঞ্চাশের দশক থকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। গল্প ল্লেখযোগ্য কিছু নয়, ছবির নির্মাণও তেমন বশিষ্ট্য দাবি করে না, অথচ গানের টানে পাগল র্শক বার বার দেখেছে একই ছবি — এমন টনা ঘটেছে বহুবার। সেসব ছবির কথা লোকে নে রেখেছে শুধু গানের জন্যই। আর যেহেতু হিন্দি গান গোটা দেশ জুড়েই জনপ্রিয় হতে পরেছে, প্রমাণ হয় যে ভাষার বাধা পেরিয়েও অর্থাৎ গানের কথা না বুঝেও) সংগীতপ্রেমীকে াকর্ষণ করার যে-ক্ষমতা এই গানের ছিল, সটা নিঃসন্দেহে সুরে-ছন্দে।

হিন্দি ছায়াছবির সংগীত পরিচালনার হাল যাঁরা রেছিলেন পঞ্চাশের দশকের কাছাকাছি, তাঁদের ধ্যে বেশিরভাগ মানুষই আজ প্রয়াত। যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁরাও সংগীতজগৎ থেকে বচ্ছিন্ন। তবু আজও তাঁদের পুরনো কাজে, তাঁদের তৈরি সুরে, আন্দোলিত হয় সংগীত-প্রেমিক মানুষ। পঞ্চাশের দশকে আমরা পেয়েছিলাম শচীন দেববর্মন, শঙ্কর-জয়কিষণ, ও.পি. নাইয়ার, রোশন, রবি এবং মদনমোহনের মতো প্রতিভাবান সুরকারদের, যাঁরা পরবর্তী দু'দশক ধরে রাজত্ব করে গেছেন হিন্দি ছবির জগতে। সেই অর্থে রাজ্যপাট না চালালেও নিঃসন্দেহে স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখতে পারেন — খৈয়াম, সি. রামচন্দ্র, চিত্রগুপ্ত এবং নৌশাদ এবং বাঙালি সংগীতপরিচালকদের মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সলিল চৌধুরী।

তবে প্রতিযোগিতার দৌড়ে সবাইকে পিছনে ফেলে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন শঙ্কর-জয়কিষণ। হিট গান আর শঙ্কর-জয়কিষণ, হিন্দি ছায়াছবির জগতে তখন প্রায় সমার্থক শব্দ। এঁদের গানে নানা ধরনের ইম্প্রোভাইজেশন, অর্কেস্ট্রেশন এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারেও অভিনবত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। আর মনমাতানো মেলডি তো ছিলই। শঙ্কর-জয়কিষণকে বলা হল — হিন্দি গানের 'ট্রেন্ডসেটার'। ঐ সময় এই জুটির প্রভাব লক্ষ করা যেত অন্যান্যদের কাজেও। খোদ শচীনকর্তাও কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই প্রভাব থেকে মুক্ত নন। যেমন, ১৯৫৭ সালের ছবি 'পেয়িং গেস্ট'। শচীনদেবের সুরে লতা গেয়েছিলেন 'চাঁদ ফির নিকলা, মগর তুম না আয়ে' — অত্যন্ত জনপ্রিয় গান। স্মৃতির সরণিতে পাঠক যদি ফিরে যান একটি বছর আগে ১৯৫৬-তে, নিশ্চয়ই মনে করতে পারবেন একটি গান — শঙ্কর-জয়কিষণের সুরে লতাজীই গেয়েছিলেন, 'রসিক বালমা' (চোরি চোরি)। এবার গান দুটো পাশাপাশি শুনে নিতে অনুরোধ জানাই কৌতূহলীজনকে।

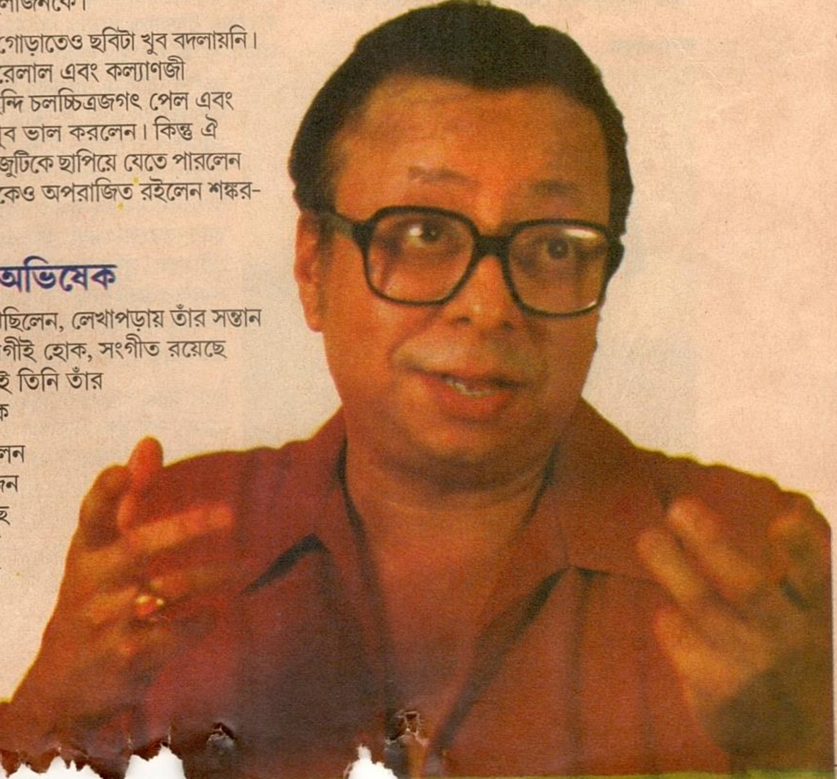
ষাটের দশকের গোড়াতেও ছবিটা খুব বদলায়নি। লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল এবং কল্যাণজী আনন্দজীকে হিন্দি চলচ্চিত্রজগৎ পেল এবং তাঁরা কাজও খুব ভাল করলেন। কিন্তু ঐ সুরের জাদুকর-জুটিকে ছাপিয়ে যেতে পারলেন না। ষাটের দশকেও অপরাজিত রইলেন শঙ্কর-জয়কিষণ।

রাহুলের অভিষেক

শচীনকর্তা বুঝেছিলেন, লেখাপড়ায় তাঁর সন্তান যত অমনোযোগীই হোক, সংগীত রয়েছে ওর রক্তে। তাই তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে

দীক্ষা দিয়েছিলেন সংগীতে। ব্রজেন বিশ্বাসের কাছে তবলা। ওস্তাদ আলি আকবর খানের কাছে সরোদ এবং স্বয়ং শচীনদেবের কাছে রাহুলের লোকসংগীত ও অন্যান্য সংগীত শিক্ষার হাতেখড়ি। ১৯৫৫ সালে, মাত্র ষোল বছর বয়সে, বাবার সহকারী হিসেবে হিন্দি চলচ্চিত্র-জগতে পা রাখলেন পঞ্চম। তখনও কি বলিউড জানে কী ঘটতে চলেছে?

শচীনকর্তা বোধহয় কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, যখন একমাত্র পুত্র ভিড়ে গেলেন প্রতিযোগী শিবিরে। হ্যাঁ, কিশোর পঞ্চম অত্যন্ত ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন শঙ্কর-জয়কিষণের। আর তাঁরাও ভালবেসে ফেলেছিলেন এই ছোট ছেলেটিকে। বিশেষত জয়কিষণের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল রাহুলের। প্রতিভা চিনে নেয় প্রতিভাকে। জয়কিষণের সঙ্গে রাহুলের একটা জায়গায় খুব মিল ছিল — দুজনেই সুর এবং অর্কেস্ট্রেশন নিয়ে প্রচুর এক্সপেরিমেন্ট করতে ভালবাসতেন। 'গুমনাম' ছবিতে জয়কিষণ একটা কাণ্ড করেছিলেন। 'গুমনাম হ্যায় কোঈ' গানটির প্রিলিউডে একধরনের আবহ সৃষ্টি করা হয়েছিল, অলৌকিক ভাব আনার জন্য। জয়কিষণ একটি করাত দিয়ে গাছের ডাল কেটে কেটে তৈরি করেছিলেন সেই আবহ। ঘটনাটি





স্টুডিওতে স্বপন চক্রবর্তী, আশা

রাহুলের মনে দাগ কেটেছিল এবং পরে তিনিও নিত্য ব্যবহার্য বহু টুকিটাকি জিনিস (যেমন চিরুনি, বোতল, গেলাস, ঝাঁটা) ব্যবহার করেছেন শব্দ-সৃষ্টির উৎস হিসেবে। জয়কিষণ বলেছিলেন, 'সুর বের করতে জানলে পাথর থেকেও বের করা যায়'।

১৯৬১ সালে প্রথম ছায়াছবিতে সুর দেন পঞ্চম। মেহমুদের ছবি — 'ছোটে নবাব'। এই ছবি তেমন হিট হয়নি এবং গানও চলেনি। ছবিতে প্লে-ব্যাক করেছিলেন লতা, রফি এবং সামসাদ বেগম। গীতিকার ছিলেন শৈলেন্দ্র। কিন্তু একমাত্র লতার গাওয়া 'ঘর আজা ঘির আঈ' ছাড়া আর কোনও গানই জনপ্রিয় হয়নি। এখানে শঙ্কর-জয়কিষণের সঙ্গে মিল হল না রাহুলের ভাগ্যের, ওঁদের প্রথম ছবি 'বরসাত'-এর গান সুপারহিট হয়েছিল।

ষাটের দশকের ওই কঠিন প্রতিযোগিতায় প্রথম ছবি ফ্লপ করা মানে দৌড়ে অনেকটা পিছিয়ে যাওয়া। তার ওপর আবার ১৯৬৩-তে এসে পড়লেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল। তাঁদের প্রথম ছবি 'পরশমণি'-র গান সুপারহিট হল। এ সময়ে নিশ্চয়ই কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল শচীনকর্তার।

চার বছর পঞ্চমের হাতে কোনও কাজ নেই। আর এই চার বছরে তোলপাড় করে দিলেন শঙ্কর-জয়কিষণ। মোট কুড়িটি ছবি এল তাঁদের — সবই সুপারহিট (আসলী নকলী, হরিয়ালী ঔর রাস্তা, হমরাহী, দিল এক মন্দির, রাজকুমার, আরজু, জানোয়ার ইত্যাদি)। এই অসম প্রতিযোগিতা একদম দমিয়ে দিল পঞ্চমকে।

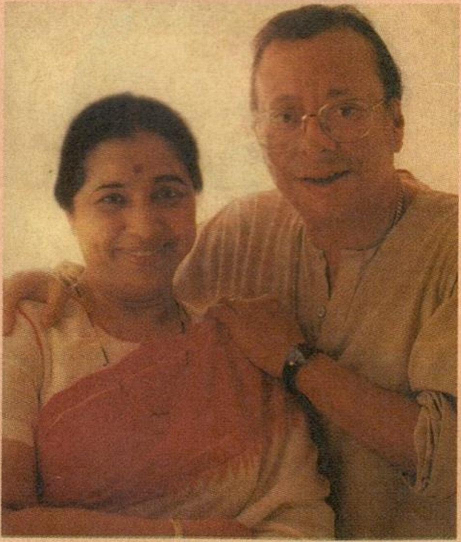
১৯৬৫ সালে আবার মেহমুদ সুযোগ দিলেন রাহুলকে। এবার গীতিকার হসরত জয়পুরী, ছবির নাম 'ভূত বাংলা'। এই ছবিতেই সূচনা হল কিশোরকুমার-রাহুলদেব জুটির; হিট হল 'জাগো সোনেওয়ালোঁ, সুনো মেরী কহানী' গানটি। মান্না দে'র গাওয়া 'আও ট্যুইস্ট করে' গানটিও জনপ্রিয় হল। পায়ের নীচে কিছুটা জমি খুঁজে পেলেন পঞ্চম। এই ছবিতে রাহুল নিজে গান গেয়েছিলেন এবং অভিনয়ও করেছিলেন।

'৬৫-তেই মুক্তি পেল তৃতীয় ছবি 'তিসরা কৌন'। এই ছবিতে প্রথম আশা ভোঁসলে গাইলেন রাহুলের সুরে। কিন্তু আবার ফ্লপ, আবার হতাশা। ওদিকে লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল এবং কল্যাণজী আনন্দজী এগিয়ে গেছেন অনেকটা। চিন্তা বাড়ছিল ত্রিপুরা রাজবাড়ির দুই প্রজন্মের দুটি পুরুষের।

১৯৬৬-তে যখন 'পতি পত্নী' ছবির গানও চলল না, তখন একেবারে ভেঙে পড়লেন রাহুল — বলিউডে তবে বোধহয় জায়গা হল না আর! এই সময়ে সংগীতজগৎ থেকে সরে যাওয়ার কথাও ভেবেছিলেন তিনি, শুধু শচীন দেববর্মনের সহকারী পরিচয়ে থাকতে একদম ভাল লাগছিল না তাঁর।

এই দুঃসময়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন শঙ্কর-জয়কিষণ। তখন তো শাম্মী কাপুরের দুরন্ত বাজার এবং সেইসব ছবির সুরকার শঙ্কর-জয়কিষণ। আসন্ন একটি ছবির জন্য শঙ্কর-জয়কিষণ প্রযোজক নাসির হুসেনকে অনুরোধ করলেন রাহুলকে সুযোগ দিতে। এই ছবির নায়ক শাম্মী কাপুর। শোনা যায়, স্বয়ং শাম্মী কাপুর নাকি এ ব্যাপারে প্রবল আপত্তি করেছিলেন এবং তা নিয়ে অনেক সমস্যাও হয়েছিল। কিন্তু নাসির সাহেব সুযোগ দিলেন রাহুলকে। এবার গান লিখলেন মজরুহ্ সুলতানপুরী আর প্লে-ব্যাক করলেন মহঃ রফি এবং আশা ভোঁসলে। মুক্তি পেল 'তিসরী মঞ্জিল'। রাহুলের এতদিনের সব ব্যর্থতা মুছে দিয়ে সুপারডুপার হিট হল ছবি। গান রেকর্ডিং-এর সময় হাজির ছিলেন স্বয়ং জয়কিষণ

আশা-রাহুল



এবং প্রচুর সাহায্য করেছিলেন রাহুলকে। গানের সুর মুগ্ধ করেছিল তাঁকে। তখনই জয়কিষণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'আজ যারা ওকে কাজ দিতে চাইছে না, আর পাঁচ বছরের মধ্যে তারাই ওর পায়ে ধরবে কাজ করার জন্য।' রাহুলের প্রশংসায় মুখর হয়েছিলেন মহঃ রফিও।

অসামান্য জনপ্রিয় হল, 'তিসরী মঞ্জিল'-এর গান। রফির কণ্ঠে 'দিওয়ানা মুঝসা নেহী' এবং 'তুম নে মুঝে দেখা' বা রফি-আশার দ্বৈতকণ্ঠে 'আজা আজা ম্যায় হুঁ প্যার তেরা', 'ও মেরে সোনা রে' এবং 'ও হাসিনা জুলফোঁওয়ালী' কাঁপিয়ে দিল ষাটের দশক। শাম্মী কাপুরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন রাহুলের — তাঁর স্টাইলটা দারুণ ধরতে পেরেছেন এই নবাগত তরুণ সংগীত-পরিচালক।

সাফল্য আর সাফল্য

আর পিছন ফিরে তাকাতে হল না। বড় ব্যানারের ছবি সুপারহিট। ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল রাহুলের। ১৯৬৭ সালে এল 'বাহারোঁ কে সপনে' এবং 'চন্দন কা পালনা'। দুটোই হিট। 'বাহারোঁ কে সপনে' ছবির 'আজা পিয়া তোহে প্যার দুঁ' (লতা) এবং 'চুনরি সম্হাল গোরী' (লতা-মান্না) খুবই জনপ্রিয় হল। এই দুটি ছবিরই গায়ক-গায়িকা ছিলেন মূলত লতা, রফি এবং মান্না দে। কিশোরকুমার তখনও পাদপ্রদীপের আলোয় আসেননি গায়ক হিসেবে।

১৯৬৮ সালে এল 'অভিলাষা'। সুপারহিট গানের ছবি। এই ছবিতেই কিশোর-লতা প্রথম ডুয়েট গাইলেন রাহুলের সুরে (প্যার হুয়া হ্যায় জব সে) জনপ্রিয়তার শিখরে উঠল রফির এবং লতার গাওয়া (দ্বৈতকণ্ঠে নয়) 'ওয়াদিয়াঁ মেরা দামন'।

এর আগে 'ছোটে নবাব' এবং 'ভূত বাংলা'-র প্রযোজক মেহমুদকে সাফল্যের মুখ দেখাতে পারেননি রাহুল। তবু মেহমুদ কিন্তু রাহুলকে ভোলেননি। ১৯৬৮ সালেই মেহমুদ প্রযোজনা করলেন একটি ছবি। পরিচালনা করলেন জ্যোতি স্বরূপ। গান লিখলেন সে যুগের কিংবদন্তী কবি এবং গীতিকার রাজিন্দর কৃষাণ এবং অভিনয়ে ছিলেন সুনীল দত্ত, সায়রা বানু, মেহমুদ, কিশোরকুমার প্রমুখ। পাঠক নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন কোন ছবির কথা বলা হচ্ছে? হ্যাঁ — পড়োসন। কিশোর-রাহুল অবিস্মরণীয় জুটির প্রথম সুপার-ডুপারহিট ছবি। যেমন দম ফাটা হাসির ছবি, তেমনই মনমাতানো গান। মেহমুদ এবং কিশোরকুমারের কী অসাধারণ কমেডি! সব মিলিয়ে দর্শক এবং শ্রোতাদের দারুণ অভ্যর্থনা পেল পড়োসন। 'মেরে সামনেওয়ালী খিড়কি মেঁ' গানটি তো প্রায় জনপ্রিয়তার শিখর ছুঁয়ে গেল। মান্না-কিশোরের দ্বৈতকণ্ঠের গান 'এক চতুর নার'-ও হিট। বলিউডে আসন পাকা করে নিলেন রাহুলদেব।

দ্বিতীয় ট্রেন্ডসেটার : ১৯৬৯ - ১৯৭৪

হিন্দি গানের ট্রেন্ডসেটার বলা হত শঙ্কর-জয়কিষণকে। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের

শ্রোতাদের কান তৈরি করে দিয়েছিলেন এই জুটি। অনেক তাবড় তাবড় সুরকাররা বদলাতে পারেননি এই ট্র্যাডিশন। অথচ নবীন সুরকার পঞ্চম সব ছক ওলটপালট করে দিলেন। ১৯৬৯-এ 'প্যার কা মৌসম' এবং 'ওয়ারিস' — মাত্র এই দুটি সুপারহিট ছবির সংগীত-পরিচালক হিসেবেই তিনি উঠে এলেন প্রথম সারিতে। 'তুম বিন যাঁউ কাঁহা', 'নিসুলতানা রে' (প্যার কা মৌসম) এবং 'এক বেচারা প্যার কা মারা' (ওয়ারিস) গেয়ে নিজের গত কুড়ি বছরের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখলেন কিংবদন্তী গায়ক সবার প্রিয় রফিসাহেব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য — 'প্যার কা মৌসম' ছবিতেও একজন কমেডিয়ানের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রাহুল।

কিন্তু তখনও অনেক বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল বলিউডের জন্য। ঐ বছরেই একটি বিস্ফোরণ ঘটালেন শচীনকর্তা। শক্তি সামন্তের ছবি 'আরাধনা'র সংগীতপরিচালনায় তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করে ফেললেন। এই ছবিটি বদলে দিল গত কুড়ি বছরের ইতিহাস। নেপথ্যসংগীতে বলিউড মাতিয়ে এলেন কিশোরকুমার। পর্দায় শাম্মী কাপুর, রাজেন্দ্রকুমার বা রাজ কাপুরের ইমেজকে পরাজিত করল নবাগত রাজেশ খান্নার রোম্যান্টিক ইমেজ। রাজেশ এবং কিশোর রাতারাতি সুপারস্টার বনে গেলেন। আর এই 'আরাধনা'র সাফল্যে রাহুলের অবদান ছিল অনেক। গানের অর্কেস্ট্রেশন, অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক তিনিই করেছিলেন।

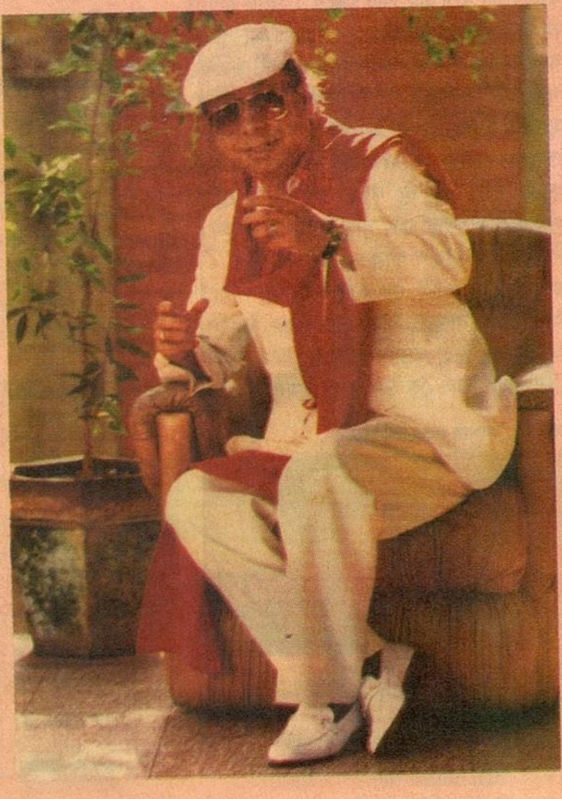
মোটের ওপর, 'আরাধনা' একটা বিরাট আঘাত হানল শঙ্কর-জয়কিষণের দুর্ভেদ্য দুর্গে। অবশ্য তার পরের বছরেই (১৯৭০) তাঁরা 'মেরা নাম জোকার' ছবিতে অসাধারণ সুর করে আবার মাতিয়ে দিলেন হিন্দি গানের জগৎ। ঐ বছর রাহুল উপহার দিলেন 'কটি পতঙ্গ'। 'মেরা নাম জোকার' এবং 'কটিপতঙ্গ।' — দুটোই সংগীতবহুল মনমাতানো গানের ছবি। কিন্তু প্রথমটি ছবি হিসেবে ফ্লপ করল এবং পরেরটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেল।

১৯৭১ সালে শঙ্কর-জয়কিষণ যেন জ্বলে উঠেছিলেন। ঐ বছর ১৭টি ছবিতে তাঁরা কাজ করেন। তার মধ্যে ছিল 'আলবেলা', 'আন্দাজ', 'জানে অনজানে', 'কাল আজ ঔর কাল', 'লাল পাথর' এবং 'পতঙ্গ'-এর মতো হিট গানের ছবি। ঐ বছর 'বেঈমান' ছবির জন্য তাঁরা ফিল্ম-ফেয়ার পুরস্কারও পান নবম বার। এইসময় রাহুল কাজ করলেন এগারোটি ছবিতে। সেগুলির গুণগত মান এমনই ছিল যে তা ছাপিয়ে গেল শঙ্কর-জয়কিষণ, লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল, কল্যাণজী আনন্দজী এবং এস. ডি. বর্মনের ছবিগুলিকে। ১৯৭১ সালে রাহুল উপহার দিয়েছিলেন 'অমর প্রেম', 'বুড্ঢা মিল গয়া', 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ', 'কারবাঁ', 'লাখোঁ মে এক', 'মেলা' এবং 'পরায়া ধন'। 'অমর প্রেম'-এর 'চিঙ্গারি কোঈ ভড়কে' (কিশোর), 'রয়না বীতি জায়ে' (লতা) এবং 'কুছ তো লোগ কহেঙ্গে' (কিশোর); 'বুড্ঢা মিল গয়া'র 'রাত কলি এক খোয়াব মে' (কিশোর); 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ'র 'দম মারো দম' (আশা), 'কাঞ্চী রে কাঞ্চী' (লতা-কিশোর); 'কারবাঁ'র 'পিয়া তু অব তো আজা' (আশা-রাহুল); 'লাখোঁ মে এক'-এর 'চন্দা ও চন্দা' (লতা এবং কিশোর — দুটি ভার্সান); 'মেলা'র 'গোরী কে হাথ মে' (লতা-রফি), 'রুত হ্যায় মিলন কি' (লতা-রফি); 'পরায়া ধন'-এর 'আজ উনসে পহেলী মুলাকাত হোগী' (কিশোর), 'তেরা মেরা জুদা হোনা' (লতা-কিশোর) — এইসব গান কাঁপিয়ে দিয়েছিল '৭১ সাল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে বছর 'অমর প্রেম'-এর মতো সংগীতবহুল গভীর প্রেমের একটি ছবি তৈরি হয়েছিল, সে বছর 'বেঈমান'-কে ফিল্ম-ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড দেওয়া নিয়ে যথেষ্ট সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। অনেকের মত ছিল, যদি শঙ্কর-জয়কিষণকে পুরস্কার দিতেই হত, তবে তা 'আন্দাজ' বা 'জানে অনজানে'র জন্য দেওয়া যেতে পারত। শোনা যায়, স্বয়ং জয়কিষণ নাকি 'বেঈমান'-কে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন পঞ্চমকে দেওয়া হোক একাত্তরের শ্রেষ্ঠ সংগীত-পরিচালকের সম্মান। এই একই দাবি করেছিলেন অভিনেতা প্রাণ।


আশা-রাহুল লাইভ

১৯৭১ সালেই ইন্দ্রপতন হল সংগীতজগতে — চলে গেলেন জয়কিষণ। ভেঙে গেল গত বাইশ বছর ধরে এক নম্বরে থাকা জুটি। এবার ঐ স্থান দখল করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাহুল, লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল (পিয়া কা ঘর, মন মন্দির, মিলন, দোস্তি, শোর, নাইট ইন লন্ডন — এল. পি-র ঝুলিতে তখন প্রচুর হিট ছবির সম্ভার), কল্যাণজী আনন্দজী এবং অবশ্যই এস. ডি. বর্মন। ছিলেন ও. পি. নাইয়ার, মদনমোহন এবং রবি। কে পেলেন সেই শূন্য সিংহাসনের দখল? মৃত্যুশয্যায় জয়কিষণজী বলে গিয়েছিলেন, 'তোমরা দেখো, আগামী দিনের সম্রাট এসে গেছে; ওকে আটকাতে পারবে না কেউ। ও ইতিহাস সৃষ্টি করবে, বদলে দেবে সমস্ত পুরনো ধ্যানধারণা।' জয়কিষণজীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'আপনারা যে ট্রেন্ড সেট করেছেন, তার কী হবে?' সস্নেহে তিনি বলেছিলেন, 'পঞ্চম সব ভেঙে চুরমার করে দেবে — নতুন ধরনের সংগীত আসতে চলেছে। ওর মতো প্রতিভাই পারবে এটা করতে। মানুষের কান নতুন করে তৈরি করতে পারবে পঞ্চম।'

অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল ভবিষ্যদ্বাণী। ১৯৭২ সাল থেকেই দুর্বার হয়ে উঠলেন আর. ডি. বর্মন। সৃষ্টি করলেন নতুন ধরনের সব ছন্দ। অর্কেস্ট্রেশনে, রেকর্ডিং-এ নতুন নতুন পদ্ধতি আনলেন। আর অনবদ্য মেলডিতে যেন সম্মোহিত করলেন শ্রোতৃকুলকে। সদর্থেই সুরছন্দের মায়াজাল ছড়িয়ে দিলেন রাহুল।





গুলজার, পঞ্চম

সংগীতের শেষ কথা তখন পঞ্চম

১৯৭২ থেকে ১৯৮০ — সময়টা খুব বেশি নয়। কিন্তু মাত্র এই আট বছরে ১২৫টি ছবিতে সংগীত পরিচালনা করলেন রাহুল। অবিশ্বাস্য, অভাবনীয় রেকর্ড! আর প্রায় প্রতিটি ছবির গান হিট (সর্বমোট গানের সংখ্যা ছিল ৬৭৬)। মজরুহ্ সুলতানপুরী, আনন্দ বক্সী, গুলজার, গুলশন বাওরা থেকে প্রবীণ কিংবদন্তী শাহির লুধিয়ানভি — সবার কথায় সুর বসিয়ে একের পর এক অনবদ্য গান সৃষ্টি করলেন পঞ্চম। কিছু ছবির উল্লেখ করি — অপনা দেশ, জওয়ানী দিওয়ানী, মেরে জীবনসাথী, পরিচয়, রামপুর কা লক্ষ্মণ, সীতা ঔর গীতা, সমাধি, অনামিকা, হীরা পান্না, জ্যায়সে কো ত্যায়সা, জোশিলা, ঝিল কে উস্ পার, নমক হারাম, রাজা রাণী, ইয়াদোঁ কি বারাত, আপ কি কসম, আজনবী, আঁধি, খুশবু, খেল খেল মেঁ, শোলে, বালিকা বধূ, মেহবুবা, হম কিসিসে কম নহী .... এরকম আরও অসংখ্য নাম। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে যেমন শঙ্কর-জয়কিষণ পরপর সুপারহিট গানের ছবি উপহার দিয়েছিলেন, সত্তরের দশকে ঠিক যেন সেই দায়িত্ব নিলেন আর. ডি। তাঁর বাড়ির দরজায় প্রযোজকের লাইন পড়ে গেল। তখন রাহুলের নাম থাকলেই রেকর্ড বিক্রি হত। ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেল জয়কিষণজীর।

দৌড়ে সবাইকে পিছনে ফেলে অনেক এগিয়ে গেলেন রাহুল। তাঁর পাশে তখন বেশ নিষ্প্রভ অন্যান্য সুরকারেরা (অবশ্য লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল এবং কল্যাণজী আনন্দজীরও জয়যাত্রা অব্যাহত ছিল; তাঁরা এইসময়ও উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন)। ১৯৭৩-এ 'নমক হারাম' ছবির অফার গিয়েছিল শঙ্করের কাছে (উনি একাই শঙ্কর-জয়কিষণের নামে সংগীত পরিচালনা করতেন।) কিন্তু তখন শঙ্করের চরম দুঃসময় চলছে। একের পর এক ছবি ফ্লপ। হতাশাগ্রস্ত শঙ্কর অফার ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা পঞ্চমকে নাও, আমি শেষ হয়ে গেছি।' এস . ডি. বর্মনের ঐ সময়ের কিছু ছবিতেও অর্কেস্ট্রেশন এবং অ্যারেঞ্জমেন্টের দায়িত্ব নিয়েছিলেন রাহুল। হয়তো কিছু সুরেও রয়ে গেছে তাঁর ছোঁওয়া।

সূর্যাস্ত ঃ মনে পড়ে শঙ্কর-জয়কিষণের কথা

শুরুটা একরকম নয় নিশ্চয়ই। চলচ্চিত্র জগতে প্রথম পদক্ষেপেই যে সাফল্য পেয়েছিলেন শঙ্কর-জয়কিষণ, রাহুল তা পাননি। কিন্তু মাঝামাঝি এবং শেষ পর্বে মিল ছিল প্রথম ট্রেন্ড-সেটারদের সঙ্গে। ১৯৮০-র পর থেকেই গ্রাফ বদলাতে শুরু করল রাহুলের। শঙ্কর-জয়কিষণ তবু বাইশ বছর টেনেছিলেন, রাহুল কার্যত শেষ হয়ে গেলেন পনের বছরেই। ১৯৮১ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত আরও ১৭৭টি ছবিতে কাজ করলেন রাহুল। কিন্তু অধিকাংশই ফ্লপ। এই দীর্ঘ পনের বছরের মধ্যে মাত্র কয়েকটি ছবির নাম উল্লেখযোগ্য — বসেরা, কুদরত, লাভ স্টোরি, রকি, সত্তে পে সত্তা, বেমিসাল, মাসুম, নমকীন, সনম তেরি কসম, শক্তি, আগর তুম না হোতে, বেতাব, ইজাজৎ এবং ১৯৪২-এ লাভ স্টোরি। অর্থাৎ ১৭৭টির মধ্যে ১৫০টিরও বেশি ছবির গান চলেনি। ওদিকে লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল এবং কল্যাণজী আনন্দজীর হিট গানের ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। অবশেষে তাঁরা ছাড়িয়ে গেলেন পঞ্চমকে। ইতিমধ্যে এসে গেছেন রাজেশ রোশন এবং বাপী লাহিড়ী। নব্বইয়ের শুরু থেকে মন এবং স্বাস্থ্য — দুটোই ভেঙে পড়েছিল পঞ্চমের। অতিরিক্ত হতাশা এবং টেনশন থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল হার্ট। ১৯৯৪ সালে ৪ জানুয়ারির সকালবেলায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চিরতরে বিদায় নিলেন রাহুল দেববর্মন।



রাজেশ খান্না, আর.ডি, আশা

সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম	ঃ রাহুল দেববর্মন
ডাকনাম	ঃ টুবলু, পঞ্চম (অশোক কুমারের দেওয়া)
জন্মদিন	ঃ ২৭ জুন ১৯৩৯
পিতা	ঃ শচীন দেববর্মন
মাতা	ঃ মীরা দেববর্মন
জন্মস্থান	ঃ কলকাতা
পড়াশোনা	ঃ কলকাতার বালিগঞ্জ গভঃ স্কুল এবং তীর্থপতি ইন্সটিটিউশন-এ।
সংগীতশিক্ষা	ঃ ব্রজেন বিশ্বাসের কাছে তবলা, ওস্তাদ আলি আকবর খানের কাছে সরোদ এবং বাবার কাছে লোকসংগীত এবং অন্যান্য সংগীতশিক্ষা।

আর.ডি, আশার মধ্যে বয় জর্জ



বিবাহিত জীবন	:	প্রথমবার বিয়ে করেন ১৯৬৫ সালে। পাত্রীর নাম রীতা প্যাটেল। সেই বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর ১৯৭৯ সালে বিয়ে করেন আশা ভোঁসলেকে। পঞ্চম ছিলেন নিঃসন্তান।
প্রথম ছবি	:	১৯৬১ সালে 'ছোটে নবাব'
শেষ ছবি	:	১৯৯৭ সালে 'অন্যায় হি অন্যায়'
সর্বমোট হিন্দি ছবি	:	২৯২ (মুক্তিপ্রাপ্ত)
সর্বমোট বাংলা ছবি	:	৩১
অন্যান্য ভাষার ছবি	:	৮ (মারাঠি, তামিল, তেলুগু এবং ওড়িয়া)
মৃত্যু	:	৪ জানুয়ারি ১৯৯৪

যাঁরা বেশি গান গেয়েছেন তাঁর সুরে

লতা মঙ্গেশকর	:	১৮১টি ছবিতে ৩৬৩টি গান
মহঃ রফি	:	৬৮টি ছবিতে ১২০টি গান
আশা ভোঁসলে	:	২৮৭টি ছবিতে ৮৪০টি গান
কিশোর কুমার	:	২০৮টি ছবিতে ৫৫৮টি গান

যাঁরা গান লিখেছেন তাঁর জন্য

আনন্দ বক্সী	:	৯৭টি ছবিতে ৫৪৩টি গান
মজরুহ্ সুলতানপুরী	:	৭৪টি ছবিতে ৪০২টি গান
গুলশন বাওরা	:	৩১টি ছবিতে ১৬০টি গান
গুলজার	:	২৫টি ছবিতে ১১৭টি গান
অনজান	:	১৪টি ছবিতে ৭০টি গান

রাহুলদেবের সহযোগী যন্ত্রশিল্পীর সংখ্যা ছিল শতাধিক। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম–

১। শশিকান্ত (তবলা/ঢোল)
২। নীতিনশঙ্কর (তবলা)
৩। ইকবাল খান (তবলা/ঢোল)
৪। অবনী দাশগুপ্ত (ঢোল)
৫। গণপতরাও যাদব (ঢোল)
৬। রৌশন (ঢোল)
৭। বাবলা (কঙ্গো)
৮। কাওয়াস লর্ড (বঙ্গো)
৯। বুগি লর্ড (ড্রাম)
১০। ফ্রাঙ্কো ভাজ (ড্রাম)
১১। ভানু গুপ্ত (স্প্যানিশ গিটার)
১২। ভুপিন্দর সিং (স্প্যানিশ/হাওয়াইয়ান)
১৩। দিলীপ নায়েক (ইলেকট্রিক গিটার)
১৪। চরণজিৎ সিং (বেসগিটার)
১৫। রনি (সিন্থেসাইজার)
১৬। কেরাসি লর্ড (পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ান)
১৭। লুইস ব্যাঙ্কস (পিয়ানো/সিন্থেসাইজার)
১৮। দক্ষিণামোহন ঠাকুর (তারসানাই)
১৯। শিবকুমার শর্মা (সন্তুর)
২০। উত্তম সিং (বেহালা)
২১। হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া (বাঁশি)
২২। ইকবাল (সারেঙ্গি)
২৩। কিশোর দেশাই (ম্যান্ডোলিন)



রাহুল
কিশোর কুমার



রাহুদেবের অ্যারেঞ্জার

১। বাসুদেব চক্রবর্তী
২। মনোহারি সিং
৩। স্বপন চক্রবর্তী
৪। বাবলু চক্রবর্তী
৫। মারুতিরাও কীব

প্রাপ্ত পুরস্কার এবং সম্মান

১) তিনবার ফিল্ম-ফেয়ার পুরস্কার — 'সনম তেরি কসম' (১৯৮২), 'মাসুম' (১৯৮৩) এবং '১৯৪২ - এ লাভ স্টোরি' (মরণোত্তর ১৯৯৪)

২) মধ্যপ্রদেশ সরকারের 'লতা মঙ্গেশকর অ্যাওয়ার্ড'

রাহুল দেববর্মন সুরারোপিত হিন্দি ছবি

১৯৬১ — ছোটে নবাব
১৯৬৫ — ভূত বাংলা, তিসরা কৌন
১৯৬৬ — পতি-পত্নী, তিসরী মঞ্জিল
১৯৬৭ — বাহারোঁ কে সপনে, চন্দন কা পালনা
১৯৬৮ — অভিলাষা, পড়োসন
১৯৬৯ — প্যার কা মৌসম, ওয়ারিস
১৯৭০ — এহ্সান, কটি পতঙ্গ, পুরস্কার, রাতোঁ কা রাজা, সাঁস ভি কভি বহু থী, দ্য ট্রেন
১৯৭১ — অধিকার, অমর প্রেম, বুড্ঢা মিল গয়া, কারবাঁ (বা ক্যারাভান), হাঙ্গামা, হরে রাম হরে কৃষ্ণ, হল্চল্, লাখোঁ মে এক, মেলা, পরায়া ধন, পেয়ার কি কহানী
১৯৭২ — অপনা দেশ, বোম্বে টু গোয়া, দিল কা রাজা, দো চোর, গরম মশালা, গোমতী কে কিনারে, জওয়ানী দিওয়ানী, মেরে জীবন সাথী, পরছাইয়াঁ, পরিচয়, রাখী ঔর হাথকড়ি, রামপুর কা লক্ষ্মণ, রাণী মেরা নাম, সমাধি, সংযোগ, সবেরা, সীতা ঔর গীতা, শাহ্জাদা

১৯৭৩ — আ গলে লাগ জা, অনামিকা, বড়া কবুতর, বধেঁ হাথ, ছলিয়া, দো ফুল, ডবল ক্রস, হীরা পান্না, হিফাজৎ, জ্যায়সে কো ত্যায়সা, জোশিলা, ঝিল কে উস পার, মিঃ রোমিও, নফরত, রাজা রাণী, নমক হারাম, পাঁচ দুশমন, রিক্সাওয়ালা, শরীফ বদমাশ, ইয়াদোঁ কি বারাত

১৯৭৪ — আপ কি কসম, আজনবী, বেনাম, চরিত্রহীন, দিল দিওয়ানা, দুস্রী সীতা, গুঞ্জ, হমশ্কল, ইমান, ইশক্ ইশক্ ইশক্, খোটে সিক্কে, মদহোশ, মনোরঞ্জন, ফির কব মিলোগী,

শয়তান, ত্রিমূর্তি, উজালা হি উজালা, জহ্‌রিলা ইনসান

১৯৭৫ — আঁধি, দীওয়ার, ধরম করম, কালা সোনা, কহতে হ্যায় মুঝকো রাজা, খেল খেল মেঁ, খুশবু, মজাক, রাজা, শোলে, ওয়ারেন্ট

১৯৭৬ — বালিকা বধূ, ভমর, বুলেট, বণ্ডলবাজ, ঢোঙ্গি, খলিফা, মহাচোর, মেহ্‌বুবা, বিশ্বাসঘাত, নহেলে পে দেহ্‌লা

১৯৭৭ — চলা মুরারি হীরো বননে, চলতা পূর্জা, চাঁদি সোনা, ডার্লিং ডার্লিং, হম কিসিসে কম নহী, জীবন মুক্ত, কর্ম, কিনারা, কিতাব, মুক্তি

১৯৭৮ — আজাদ, ভোলা ভালা, চোর হো তো অ্যায়সা, দেবতা, ঘর, হীরালাল পান্নালাল, নৌকরি, কস্‌মে ওয়াদে, নয়া দৌড়, ফন্দেবাজ, শালিমার

১৯৭৯ — ভলা মানুষ, গোলমাল, জুরমানা, হমারে তুম্‌হারে, ঝুটা কাহিঁ কা, মঞ্জিল, নৌকর, রত্নদীপ, সালাম মেমসাব, দ্য গ্রেট গ্যাম্বলার

১৯৮০ — আঁচল, আবদুল্লা, আলিবাবা ঔর চালিস্ চোর, বুলন্দি, ধন দৌলত, গুণাহ্‌গার, জলমহল, কাতিল কৌন, খুবসুরত, ফির ওহী রাত, রেড রোজ, শান, সিতারা, টক্কর, দ্য বার্নিং ট্রেন

১৯৮১ — অঙ্গুর, বরসাত কি এক রাত, বসেরা, বিবি ও বিবি, দৌলত, ধুঁয়া, গেহ্‌রা জখম, হরজাই, ঘুঙরু কি আওয়াজ, জেল যাত্রা, কালীয়াঁ, কচ্চে হীরে, কুদরত, লাভ স্টোরি, মঙ্গলসূত্র, নরম গরম, রক্ষা, রকি, সস্তে পে সত্তা, জমানে কো দিখানা হ্যায়

১৯৮২ — আমনে সামনে, অধুরা আদমী, অশান্তি, বেমিসাল, দর্দ কা রিশ্‌তা, গঙ্গা মেরী মা, মাসুম, নমকীন, সনম তেরি কসম, শক্তি, শৌকীন, স্বামী দাদা, তেরি কসম, ইয়ে তো কামাল হো গয়া, ইয়ে ওয়াদা রহা



লক্ষ্মীকান্ত

১৯৮৩ — আন ঔর শান, অগর তুম না হোতে, বড়ে দিলওয়ালা, বেতাব, বিন্দিয়া চমকেগী, বক্সার, চোর পুলিশ, ফরিশ্‌তা, জানে জাঁ (বা নিকম্মা), কৌন ক্যায়সে, লাভারস্, মহান, ম্যায় আওয়ারা হুঁ, মজদুর, পুকার, কয়ামত, রং বিরঙ্গী, রোমান্স, শুভকামনা

১৯৮৪ — আনন্দ ঔর আনন্দ, অন্দর বাহার, আওয়াজ, ভীমা, দুনিয়া, হম দোনো, হম হ্যায় লা জবাব, জাগীর, জওয়ানী, ঝুটা সচ, করিশ্মা, মাটি মাঙ্গে খুন, মঞ্জিল মঞ্জিল, মুসাফির, সানি, ইয়ে দেশ, জমীন আস্‌মান

১৯৮৫ — আরপার, অলগ-অলগ, অমীর আদমী গরীব আদমী, অর্জুন, আওয়ারা বাপ, বণ্ড ৩০৩, এক সে ভলে দো, হম নওজোয়ান, লাভা, উঁচে লোগ, রাহী বদল গয়ে, রাম তেরে কিতনে নাম, রুসওয়াই, সাগর, সিতমগর, সবেরেওয়ালী গাড়ি, শিবা কা ইনসাফ, জবরদস্ত

১৯৮৬ — অনোখা রিশ্‌তা, এক ম্যায় ঔর এক তু, জীভা, পালে খান, সমুন্দর, শত্রু, জিন্দেগানী

১৯৮৭ — অপনে অপনে, বে-লাগাম, ডেকয়েট, হিফাজৎ, ইজাজৎ, ইনাম দশ হাজার, ইতিহাস, জালিয়ানওয়ালাবাগ, মরদোঁওয়ালী বাত

১৯৮৮ — চত্রন, খরিদার, আজ রাত কো (বা ফয়সালা), মিল গঈ মঞ্জিল মুঝে, না-মুমকিন, রামা ও রামা, জল্‌জলা

১৯৮৯ — আগ সে খেলেঙ্গে, বহুরাণী, দোস্ত, জোশিলে, জুর্‌রত, পরিন্দা

১৯৯০ — চোর পে মোর, দুশমন, জীনে দো

১৯৯১ — গুণেহ্‌গার কৌন, ইন্দ্রজিৎ, ঝুটি শান, লিবাস্

১৯৯২ — দ্রোহী, জয় শিবশঙ্কর, জনম সে পহেলে, খুলে আম, সরফিরা, সিয়াসত্

১৯৯৩ — আজা মেরি জান (একটি মাত্র গান রাহুলের সুরে), গরদিশ, গুরুদেব, ১৯৪২ এ লাভ স্টোরি, প্রোফেসর কি পড়োসন, তুম করো ওয়াদা

১৯৯৬ — ঘটক, সৌতেলা ভাই, ইয়ার মেরী জিন্দেগী

১৯৯৭ — অন্যায় হি অন্যায়

অসমাপ্ত বা মুক্তি না-পাওয়া ছবির তালিকা

আওয়ারা রাজু, আভি আভি, অঙ্কুশ, বড়ে মিয়াঁ, বেবস্, ভরোসা, চাবি চোর কে হাথ, ডাগ্‌দরবাবু, দেবদাস, দুশমন দোস্ত, এক দো তিন চার, গ্যাং, গিরাফ্‌তার, গুণাহোঁ কা দেব্‌তা, জানে জানা, জান সে পেয়ারা, জব পেয়ার হুয়া, জীবন সাত সুরোঁ কা সঙ্গম, কশ্‌মাকশ, খোয়াইশ, লাঠি, লাভ এণ্ড ওয়ার, মেজান, মিঃ হাসমুখ, নাম হ্যায় কৃষ্ণ, নজরানা, পুলিস কে পিছে পুলিস, প্রোডাকশন নং ১, পেয়ার তো হোনা হি থা, সদা সুহাগন, শিকার শিকারী কা, সোনে কী লঙ্কা, সবসে বড়া পাপ, টাইম লিমিট, তড়প এইসী ভি হোতী হ্যায়, ওয়াপ্‌সি, জঞ্জীরেঁ, জুল্‌মী।

বাংলা ছবির তালিকা

১৯৭০ — রাজকুমারী
১৯৮০ — অনুসন্ধান
১৯৮১ — কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী
১৯৮২ — অপরূপা, ত্রয়ী
১৯৮৪ — তিনমূর্তি
১৯৮৫ — অন্যায় অবিচার
১৯৮৭ — একান্ত আপন
১৯৮৮ — আগুন
১৯৮৯ — আক্রোশ, ঝঙ্কার, শতরূপা
১৯৯০ — আপন আমার আপন, এখানে আমার স্বর্গ, লড়াই, অন্ধ বিচার
১৯৯১ — আনন্দ নিকেতন, বহুরাণী, দেবতা, ক্রোধী, নবাব, অহঙ্কার
১৯৯২ — মা, অধিকার, পুরস্কার, পুরুষোত্তম, শ্বেত পাথরের থালা
১৯৯৩ — শেষ চিঠি, শ্রদ্ধাঞ্জলী
১৯৯৪ — অজানা পথ
বিরোধ (মুক্তি পায়নি)

কিশোর - আর. ডি মেড ফর ইচ আদার

পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে মহঃ রফি ছিলেন বলিউডে পুরুষকণ্ঠের এক নম্বর প্লে-ব্যাক সিঙ্গার। তুলনায় বেশ পিছিয়ে ছিলেন মুকেশ, মান্না দে, কিশোরকুমার, তালাত মাহ্‌মুদ বা মহেন্দ্র কাপুর। ঐ সময় কিশোরকুমার বিখ্যাত ছিলেন কমেডিয়ান অভিনেতা হিসেবে। লোকে জানত ইনি প্লে-ব্যাকও করেন, তবে গায়ক হিসেবে তেমন খ্যাতি পাননি তখনও। শচীন দেববর্মন ছাড়া অন্য কোনও সুরকার বা সংগীতপরিচালক ধারাবাহিক ভাবে ব্যবহারও করেননি কিশোরকে। যদিও শঙ্কর জয়কিষণের 'নিউ দিল্লী' এবং 'রঙ্গোলী', মদনমোহনের 'ভাই ভাই' এবং 'চাচা জিন্দাবাদ', রবি-র 'দিল্লী কা ঠগ' এবং 'বোম্বাই কা চোর', ও. পি. নাইয়ারের 'কভি আন্ধেরা কভি উজালা', 'বাপ রে বাপ' এবং 'নয়া আন্দাজ', সলিল চৌধুরীর 'হাফ টিকিট', হেমন্তকুমারের 'মিস্ মেরী' এবং 'দো

দুনি চার' — ইত্যাদি ছবিতে কিশোরের গাওয়া কিছু অসাধারণ গানের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু নেপথ্যসংগীতের জগতে তখনও কিশোরের ধারাবাহিক কাজের দৃষ্টান্ত নেই। ষাটের দশকে লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালও (হম সব উস্তাদ হ্যায়, মিঃ এক্স ইন বোম্বে) গান হিট করিয়েছিলেন কিশোরকে দিয়ে। কিন্তু সিংহাসনে তখনও রফিসাহেব।

রাহুলও মহঃ রফির কণ্ঠের ওপর নির্ভর করেই শুরু করলেন তাঁর সংগীতজীবন (এক্ষেত্রে 'তিসরী মঞ্জিল'কেই ধরছি কারণ, ছবি হিসেবে ওটাই প্রথম হিট)। তাই 'তিসরী মঞ্জিল', 'বাহারোঁ কে সপনে', 'চন্দন কা পালনা', 'অভিলাষা', 'পেয়ার কা মৌসম' এবং 'ওয়ারিস' ছবিতে আমরা সেই স্বর্ণকণ্ঠেরই জয়জয়কার দেখতে পেলাম। এ সময়ে আর. ডি একটাই ছবিতে রফিকে নেননি, তা হল 'পড়োসন'।

১৯৬৯-এ শচীন দেববর্মন বদলে দিলেন সবকিছু। 'আরাধনা' ছবিটি নতুন করে ইতিহাস সৃষ্টি করল বলিউডে। এই একটি ছবিতেই আসর মাত করলেন কিশোর। এরপর তো শুধু 'কিশোর' আর 'কিশোর' — আর কোনও গায়ক মাথা তুলতেই পারলেন না তাঁর জীবদ্দশায়।

সত্তরের দশকে রাহুলও শুরু করলেন কিশোরকে দিয়ে। এল একে একে 'কটি পতঙ্গ', 'অমর প্রেম', 'পরায়া ধন', 'অপনা দেশ', 'বোম্বে টু গোয়া', 'জওয়ানী দিওয়ানী', 'মেরে জীবন সাথী', 'হীরা পান্না' বা 'জোশিলা'র মতো সুপারহিট গানের ছবি। তখন কিশোর-আর. ডি-র যুগলবন্দিতে আপ্লুত শ্রোতারা। এই জুটির সাফল্য এবং জনপ্রিয়তা মনে করিয়ে দেয় লতা-শঙ্কর জয়কিষণ, লতা-মদনমোহন, রফি-শঙ্কর জয়কিষণ বা আশা-ও.পি.নাইয়ারের জুটির কথা। তবে এইসময়ে রাহুল কিন্তু রফিসাহেবকে ভুলে যাননি। সত্তরের 'রাতোঁ কা রাজা' বা 'দ্য ট্রেন', একাত্তরে 'কারবাঁ' এবং 'মেলা', বাহাত্তরে 'দিল কা রাজা', তিয়াত্তরে 'ইয়াদোঁ কি বারাত', সাতাত্তরে 'হম কিসিসে কম নহী' এবং আশিতে 'আবদুল্লা', 'শান' এবং 'দ্য বার্নিং ট্রেন'-এ রফি সাহেব গেয়ে গেছেন তাঁর প্রিয় 'পঞ্চম'-এর সুরে। অবশ্য চুয়াত্তর, পঁচাত্তর এবং ছিয়াত্তর — এই তিন বছর তাঁর গাওয়া তেমন উল্লেখযোগ্য গান নেই রাহুলের ছবিতে (দু-একটি ছবিতে একটি করে গান গেয়েছিলেন, যেমন 'গুঞ্জ', 'হমশকল' বা 'আঁধি')। এই সময় শচীনকর্তাও বেশ কম ব্যবহার করেছেনে মহঃ রফিকে। রাহুল মুকেশকেও সুযোগ দিয়েছিলেন 'কটি পতঙ্গ'-এ। ১৯৭০-এ রাজেশ খান্নার লিপে কিশোরের জায়গায় মুকেশ! — অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। 'জিস গলি মে তেরা ঘর না হো বালমা' গানটি অন্য মাত্রা পেয়েছিল মুকেশের দরদী কণ্ঠে।

জহুরী জহর চিনতে ভুল করে না। প্রয়োজনমতো সঠিক গায়ককে বেছে নিতে ভুল করেননি রাহুল। তবে রাহুলদেবের 'গায়ক' বলতে বোঝায় কিশোরকুমারকেই। রাহুলের সৃষ্টির সফলতম রূপকার ছিলেন কিশোর। আজও কী অসম্ভব জনপ্রিয়তা এই জুটির! রাহুল তাঁর অভিনবত্বের ভাণ্ডার যেন উজাড় করে দিয়েছিলেন এই মহান শিল্পীর জন্যে। একবার তালিকায় চোখ রাখুন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৩ এই দশ বছরের ছবির মধ্যে যে নামগুলি পাবেন, তা হল — 'অনামিকা', 'জ্যায়সে কো ত্যায়সা', 'রাজা রাণী', 'দৌলত কে দুশমন' (বা 'পাঁচ দুশমন'), 'শরীফ বদমাশ' 'আপ কি কসম', 'আজনবী', 'আঁধি', 'খুশবু', 'মেহ্‌বুবা', 'ডার্লিং ডার্লিং', 'কসমে ওয়াদে', 'কুদরত' — ইত্যাদি। এই ছবিগুলির অন্যতম সম্পদ ছিল কিশোরের গান। দেব আনন্দ, রাজেশ খান্না, জীতেন্দ্র, সঞ্জীবকুমার বা অমিতাভ বচ্চন — নায়ক যিনিই হোন না কেন, গায়ক একমাত্র কিশোর। রাজেশ খান্নার ফিল্ম-কেরিয়ারটাই তো দাঁড়িয়ে ছিল কিশোর-রাহুল জুটির ভরে। ১৯৮৭ সালে চলে গেলেন কিশোর। ভেঙে গেল রাহুলের মন। কিন্তু হারাল না কিশোর-আর.ডি অবিস্মরণীয় জুটি। আজকের প্রজন্মও এই জুটির গান শোনার জন্য পাগল। এমন মানিকজোড় কোটিকে গুটিক!

একনজরে রাহুল-কিশোর

প্রথম ছবি	ঃ	'ভূত বাংলা' (১৯৬৫)
প্রথম গান	ঃ	'জাগো সোনেওয়ালোঁ'
সর্বমোট ছবি	ঃ	২০৮
সর্বমোট গান	ঃ	৫৫৮

জনপ্রিয়তার বিচারে সেরা দশটি গান

১) কহনা হ্যায় (পড়োসন)
২) তুম বিন যাউঁ কাঁহা (পেয়ার কা মৌসম)
৩) পেয়ার দিওয়ানা হোতা হ্যায় (কটি পতঙ্গ)
৪) চিঙ্গারি কোঈ ভড়কে (অমর প্রেম)
৫) ও মেরে দিল কে চ্যায়েন (মেরে জীবন সাথী)
৬) মেরি ভীগি ভীগি সি (অনামিকা)
৭) ম্যায় শায়র বদনাম (নমক হারাম)
৮) জিন্দেগী কে সফর মেঁ (আপ কি কসম)
৯) ও হন্‌সিনী মেরী হন্‌সিনী (জহরিলা ইনসান)
১০) হমে তুম সে পেয়ার কিতনা (কুদরত)

কৌশিক মৈত্র ও সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ বিশ্বাস নেরুরকর, রশেষ শাহ, অপূর্ব পোদ্দার

লতা, রাহুল



কুছ না কহো, কুছ ভী না কহো
(লতা-রাহুল)

পঞ্চমের সুরে আশা ভোঁসলে সর্বাধিক গান গাইলেও রাহুলের অসাধারণ সুরসৃষ্টির এক বড় অংশই শোনা গেছে লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৯৪ — দীর্ঘ ৩৪ বছরের পরিক্রমণ যেমন সার্থক, তেমনই বহুবর্ণে রঞ্জিত। আর এই দীর্ঘ পথ চলায় পঞ্চমের সুরে অগণিত সংগীতপিপাসু চিত্তকে ভরিয়ে তুলেছেন সংগীতসম্রাজ্ঞী ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকর।

পঞ্চমের সুরে লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া গানের সংখ্যা ৩৫০টি। এরমধ্যে আছে ১৭২টি হিন্দি ছবিতে (দু একটি ছবি এখনও মুক্তি পায়নি), ৩৩৩টি গান (১৯৬১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ছোটে নবাব' ছবির 'ঘর আজা ঘির আঈ' থেকে ১৯৯৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত '১৯৪২ এ লাভ স্টোরি' ছবির 'কুছ না কহো'), ৯টি বাংলা ছবিতে ১৪টি গান, ২টি বাংলা আধুনিক গান এবং ১টি বাংলা ভার্সান গান (কিছু বোলো না)।

লতা মঙ্গেশকর এবং রাহুল দেববর্মনের মেলবন্ধনে সৃষ্ট গানগুলিকে কয়েকটি 'মুড'-এ ভাগ করা যাক —

(১) **ভক্তিমূলক** - ন মুঝমে শুন কহীঁ এ্যায়সা — পতি পত্নী (১৯৬৬), বড়া নটঘট হ্যায় রে কৃষ্ণ কানহাইয়া — অমর প্রেম (১৯৭১)ওম জয় জগদীশ হরে — আবদুল্লা (১৯৮০) ইত্যাদি।

(২) **লোরী** - সনন সনন পবন চলে সো জা মেরে লাল — বেনাম (১৯৭৪), লল্লা লল্লা লোরী — মুক্তি (১৯৭৭), মেরে রাজা তু সো জা — (১৯৯০) ইত্যাদি।

(৩) **শাস্ত্রীয় সংগীত আধারিত গান** - ঘর আজা ঘির আঈ— ছোটে নবাব (১৯৬১), মেরে নয়না শাওন ভাদো — মেহেবুবা (১৯৭৬),

অব কে না শাওন বরসে — কিনারা (১৯৭৭), হবাএঁ প্রভাতী — শুভকামনা (১৯৮৩) ইত্যাদি।

(৪) **মদিরামত্ত গান** - শরাবী শরাবী মেরা নাম — চন্দন কা পালনা (১৯৬৭), হাঁ জী হাঁ ম্যায়নে শরাব পী হ্যায় — সীতা ঔর গীতা (১৯৭২) ইত্যাদি।

(৫) **বিষাদ** - ন জানে কিঁউ দিল সে — অগর তুম না হোতে (১৯৮৩), হো ছোড় কে ভৈয়া কা দেশ — বিন্দিয়া চমকেগী (১৯৮৩) ইত্যাদি।

(৬) **উৎসবের গান** - ও গঙ্গা মাইয়া — চন্দন কা পালনা (১৯৬৭), আজ না ছোড়েঙ্গে বস হমজোলী (কিশোরকুমারের সঙ্গে) শোলে (১৯৭০), করবা চৌথ কা পাবন ব্রত — জুরত (১৯৮৯) ইত্যাদি।

(৭) **নাচের গান** - দো ঘুঁট মুঝে ভী পিলা দে — ঝীল কে উস পার (১৯৭৩), নাচো রে হা নাচো রে মেরে প্যার — বন্ধে হাথ (১৯৭৩), কাঁটা লাগো রে দেবরিয়া — কচ্চে হীরে (১৯৮১) ইত্যাদি।

(৮) **পাশ্চাত্য সংগীত প্রভাবিত গান** - দিলবর দিলসে প্যারে — কারবাঁ (১৯৭১), সাজন কহাঁ জাউঁগী ম্যায় — জ্যায়সে কো ত্যায়সা (১৯৭৩), এ্যায়সা সমা ন হোতা — জমীন আসমান (১৯৮৪) ইত্যাদি।

(৯) **রোম্যান্টিক গান** - কাঞ্চী রে কাঞ্চী রে (কিশোরকুমারের সঙ্গে) — হরে রাম হরে (১৯৭৫), কসমে ওয়াদে নিভায়েঙ্গে হম (কিশোরকুমারের সঙ্গে) — কসমে ওয়াদে (১৯৭৮) ইত্যাদি।

(১০) **লোকসংগীত প্রভাবিত**- গোয়া কে চুনাঞ্চে (কিশোরকুমার ও মান্না দে-র সঙ্গে) — মনোরঞ্জন (১৯৭৪) ইত্যাদি।

(১১) **মুজরা** - লাল চুনরিয়া ওঢ় কে — রাজা রাণী (১৯৭৩), আপকে শহর মেঁ — মেহেবুবা (১৯৭৬), লো সাহিব ফির — মাটি মাঙ্গে খুন (১৯৮৪) ইত্যাদি।

পঞ্চমের সুরে এত বিভিন্ন ধরনের গান সম্ভবত অন্য কোনও শিল্পীর কণ্ঠে শোনা যায়নি। অনেক বাংলা এবং হিন্দি ছবি কেবলমাত্র রাহুল দেববর্মনের সুর এবং লতা মঙ্গেশকরের গাওয়ার জন্যই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। শ্রোতারা সেইসব ছবি এবং গান সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ওয়াকিবহাল। অনুসন্ধান (১৯৮১), কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী (১৯৮১), নবাব (১৯৯১), শ্বেত পাথরের থালা (১৯৯২) ইত্যাদি বাংলা ছায়া ছবিতে লতার গাওয়া গান আজও অসম্ভব জনপ্রিয়। আর ১৯৬৫-তে গাওয়া 'আমি বলি তোমায় দূরে থাকো' এবং 'আমার মালতীলতা' — এই দুটি বেসিক গান সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৯৬৮-তে বিবিধ ভারতী প্রচারিত 'জয়মালা' অনুষ্ঠানে রাহুল দেববর্মন তাঁর পছন্দের কয়েকটি গান বাজিয়ে শোনান। তালিকাটি ছিল এইরকম — কজরে বদরবারে - পতি পত্নী, ও গঙ্গা মাইয়া - চন্দন কা পালনা, শরাবী শরাবী মেরা নাম - চন্দন কা পালনা, চুনরি সম্‌হাল গোরী (মান্না দে-র সঙ্গে) - বাহারোঁ কে সপনে, মেরে সামনেওয়ালি খিড়কি মেঁ - পড়োসন, ঘর আ জা ঘীর আই - ছোটে নবাব এবং কহনা হ্যায় - পড়োসন।

প্রসঙ্গটি উল্লেখ করলাম এই কারণে যে ১৯৬৬ সালে 'তিসরী মঞ্জিল' মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গানগুলি জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছয় এবং আশা-রাহুলদেব জুটি তৈরি হয় বলে অনেকেই মনে করেন। অথচ ১৯৬৮ সালে রাহুলদেব তাঁর নির্বাচিত গানের মধ্যে 'পড়োসন' ছবির দুটি গান বাদে (গান দুটি গেয়েছিলেন কিশোরকুমার) অন্য গানগুলির সবই লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া গান থেকে নির্বাচন করেন।

স্নেহাশিস চট্টোপাধ্যায়


কুমার শানু, রাহুল, আশা

রাহুল দেববর্মন সুরারোপিত বাংলা আধুনিক গানের তালিকা

	গান	শিল্পী	গীতিকার
১)	আমি বলি তোমায়	লতা মঙ্গেশকর	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
২)	আমার মালতী লতা	"	"
৩)	লক্ষ্মীটি দোহাই তোমার	আশা ভোঁসলে	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
৪)	কি জাদু তোমার চোখে	"	"
৫)	আজ দোলে মন কার ইশারাতে	"	স্বপন চক্রবর্তী
৬)	আসবো আরেক দিন	"	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
৭)	আজকে থেকে যাও	"	স্বপন চক্রবর্তী
৮)	আকাশে সূর্য আছে	"	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
৯)	আমায় সবাই পাগল বলে	"	"
১০)	একটু আরো নয় কাছে	আশা এবং পঞ্চম	"
১১)	আজহার ভাইজান	"	স্বপন চক্রবর্তী
১২)	আরে ও মন-মাঝি	"	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
১৩)	খুব চেনা চেনা মুখখানি	আশা ভোঁসলে	স্বপন চক্রবর্তী
১৪)	আর পারি না	"	প্রিয় চট্টোপাধ্যায়
১৫)	বাঁশি শুনে কি ঘরে	"	স্বপন চক্রবর্তী
১৬)	ভাবিনি কোনদিন এভাবে	"	প্রিয় চট্টোপাধ্যায়
১৭)	ভেবেছি ভুলে যাবো	"	স্বপন চক্রবর্তী
১৮)	ভেঙে যায় মন ভেঙে যায়	"	"
১৯)	বঁধুয়া রিমিঝিমি এই শ্রাবণে	"	"
২০)	চাই না আমার রেশমী চুড়ি	"	স্বপন চক্রবর্তী
২১)	বৌ কথা কও	"	"
২২)	ছন্দে ছন্দে গানে গানে	"	"
২৩)	ছোট্ট সে ছেলেবেলা	"	প্রিয় চট্টোপাধ্যায়
২৪)	চৈতালী গো চৈতালী	"	
২৫)	চোখে চোখে কথা বলো	"	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
২৬)	চোখে নামে বৃষ্টি	"	"
২৭)	চলো চলে যাই	আশা এবং পঞ্চম	স্বপন চক্রবর্তী
২৮)	ডাক পাঠালে কাল সকালে	"	"
২৯)	এই শোন, আজকে	"	"
৩০)	জানিনা কোথায় তুমি	"	শচীন ভৌমিক
৩১)	যায় রে যায় রে	"	স্বপন চক্রবর্তী
৩২)	ফিরে এলাম দূরে গিয়ে	"	"
৩৩)	তুমি কত যে দূরে	"	"
৩৪)	এই এসো না কাছে	আশা ভোঁসলে	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
৩৫)	উড়ে যাবো আমরা	"	স্বপন চক্রবর্তী
৩৬)	এ কি ভালবাসা	"	"
৩৭)	একটা দেশলাই কাঠি জ্বালো	"	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
৩৮)	একটা কথাই আমি যে শুধু	"	স্বপন চক্রবর্তী
৩৯)	একটা কথাই হায় সে যে	"	

৪০)	গা পা গা রে সা	আশা ভোঁসলে	স্বপন চক্রবর্তী
৪১)	গুনগুন ভ্রমরা	”	”
৪২)	হায় গো আমার	”	”
৪৩)	কিনে দে রেশমী চুড়ি	”	”
৪৪)	যাব কি যাব না ভেবে	”	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
৪৫)	যাকে ভালবাসি রে	”	”
৪৬)	জানি জানি আমি জানি	”	স্বপন চক্রবর্তী
৪৭)	যেতে দাও আমায় ডেকো না	”	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
৪৮)	ঝিলমিল ঝিলমিল তারা	”	স্বপন চক্রবর্তী
৪৯)	ঝুম ঝুম ঝুম রাত নিঃঝুম	”	”
৫০)	জ্বলে যাই গো পুড়ে যাই	”	প্রিয় চট্টোপাধ্যায়
৫১)	জ্বলে যায় জ্বলে যায়	”	স্বপন চক্রবর্তী
৫২)	কে যে আমার ঘুম ভাঙিয়ে	”	”
৫৩)	যেতে পারো যাও না	”	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
৫৪)	কি করে আসি তোমার পাশে	”	”
৫৫)	সেই পরদেশীয়া এলো	”	স্বপন চক্রবর্তী
৫৬)	কথা দিয়ে এলে না	”	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
৫৭)	কোথা কোথা খুঁজেছি	”	স্বপন চক্রবর্তী
৫৮)	লুকাবো প্রেম কি করে	”	প্রিয় চট্টোপাধ্যায়
৫৯)	মাছের কাঁটা খোঁপার কাঁটা	”	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
৬০)	মেঘে রোদে মিলে মিশে	”	প্রিয় চট্টোপাধ্যায়
৬১)	মহুয়ায় জমেছে আজ মৌ	”	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
৬২)	ময়না বলো তুমি কৃষ্ণ	”	”
৬৩)	না ডেকো না	”	স্বপন চক্রবর্তী
৬৪)	না এখনই না যাবে যদি	”	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
৬৫)	না না না পারবো না	”	স্বপন চক্রবর্তী
৬৬)	ঠাকুরঝি কেমন তোমার ভাই	”	”
৬৭)	ফুলে গন্ধ নেই এ তো	”	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
৬৮)	পোড়া বাঁশি শুনলে এ মন	”	”
৬৯)	রিমঝিম বৃষ্টি	”	প্রিয় চট্টোপাধ্যায়
৭০)	রূপসী বল না কে বেশি	”	”
৭১)	সন্ধ্যাবেলায় তুমি আমি বসে	”	স্বপন চক্রবর্তী
৭২)	তোমার যে ঐ হাতের	”	”
৭৩)	তোমার কাছ থেকে পালিয়ে	”	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
৭৪)	তুমি যাবে গো চলে	”	স্বপন চক্রবর্তী
৭৫)	ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়া	”	”
৭৬)	বল কি আছে গো	রাহুল দেববর্মন	”
৭৭)	ডেকে ডেকে কত কথা	”	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
৭৮)	অ-এ অজগর আসছে তেড়ে	”	যোগীন্দ্রনাথ সরকার
৭৯)	এলে না তুমি যে	”	শচীন ভৌমিক
৮০)	ট্যাংরা তবু কত যায়	”	স্বপন চক্রবর্তী
৮১)	যেতে যেতে পথে হল দেরী	”	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
৮২)	কাল কখন আসবে বল না	”	স্বপন চক্রবর্তী
৮৩)	কে কান্দে রে হায় রে	”	শচীন ভৌমিক
৮৪)	কেউ জানে না তুমি যে	”	স্বপন চক্রবর্তী
৮৫)	কি হবে আর পুরনো	”	”
৮৬)	মধুমাস যায় মধুমাস	”	”
৮৭)	মনে পড়ে রুবি রায়	”	শচীন ভৌমিক
৮৮)	নদীর পাড়ে উঠছে ধোঁয়া	”	স্বপন চক্রবর্তী
৮৯)	ও সজনী গো প্রেমের কথা	”	”
৯০)	আগে আমি যদি জানতাম	”	”
৯১)	ফিরে এসো অনুরাধা	”	শচীন ভৌমিক

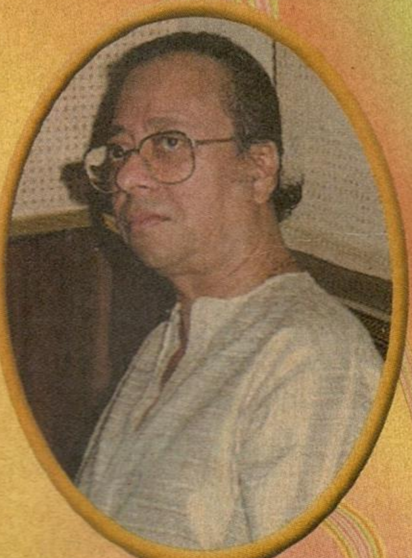
৯২)	শোন, এই তো সময়	”	স্বপন চক্রবর্তী
৯৩)	শোন মন বলি তোমায়	”	
৯৪)	স্বপ্ন আমার হারিয়ে গেছে	”	শচীন ভৌমিক
৯৫)	তোমার কথা নিয়ে আমি	”	স্বপন চক্রবর্তী
৯৬)	তোমাতে আমাতে দেখা	”	”
৯৭)	আকাশ কেন ডাকে	কিশোরকুমার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
৯৮)	বাবা খোকা	”	মুকুল দত্ত
৯৯)	বোম বোম মকু প্রাণ হাঁকুপাকু	”	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
১০০)	চলেছি একা	”	মুকুল দত্ত
১০১)	একদিন পাখী উড়ে যাবে	”	”
১০২)	সে তো এল না	”	”
১০৩)	আগামী শিশুরা	ঊষা উত্থুপ	শচীন ভৌমিক
১০৪)	আমি জানি তুমি আসবে	”	বিশ্বনাথ চ্যাটার্জি
১০৫)	আমি তুমি দুজনাতে	”	শচীন ভৌমিক
১০৬)	বাতি নেই কলকাতাতে	”	”
১০৭)	কাছে এসো হীরো জী	”	”
১০৮)	মানো, মানো না	”	মুকুল দত্ত
১০৯)	রাতে তারা আছে	”	শচীন ভৌমিক
১১০)	সুখ নেই গো কপালে	”	”
১১১)	কিছু বোলো না (কুছ না কহো গানের বাংলা ভার্সান)	লতা মঙ্গেশকর	মুকুল দত্ত
১১২)	কিছু বোলো না	কুমার শানু	মুকুল দত্ত
১১৩)	এক কন্যাকে দেখে তো	”	”
১১৪)	রাগ না করো যদি	”	”
১১৫)	রিমঝিম রিমঝিম	শানু, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি	”
১১৬)	ধীরে ধীরে দিন গোনা	ইন্দ্রাণী সেন	শ্যামল সেনগুপ্ত
১১৭)	এ মোর চলার পথে	”	পূর্ণেন্দু রায়
১১৮)	গুন গুন গুঞ্জরে	”	শ্যামল সেনগুপ্ত
১১৯)	কে তুমি ডাকলে আমায়	”	”
১২০)	কি চোখে দেখেছি তোমায়	”	সঞ্জয় চক্রবর্তী
১২১)	সেই তো আছে ঠিকানা	”	”
১২২)	স্মৃতির ওপারে	”	”
১২৩)	ফাগুনের ছোঁয়াতে	ইন্দ্রাণী সেন	শ্যামল সেনগুপ্ত
১২৪)	এ পাড় ভাঙে	অমিত কুমার	স্বপন চক্রবর্তী
১২৫)	যেও না যেও না	”	”
১২৬)	কত দিন আর	”	”
১২৭)	পথ চেয়ে বসেছিলাম	”	”
১২৮)	প্রাণ তো মানে না গো	”	”
১২৯)	শোন রুবি শোন	”	”
১৩০)	মন আজ নিরাশ	শিবাজি চট্টোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
১৩১)	মন না জানো	কবিতা কৃষ্ণমূর্তি	”
১৩২)	ওম জয় দেবী চামুণ্ডে	স্বপন চক্রবর্তী	প্রচলিত
১৩৩)	ওম জয় দেবী দুর্গে	আশা, স্বপন চক্রবর্তী	স্বপন চক্রবর্তী
১৩৪)	পাঠশালাতে ইঁদুর এল	এস. পি. বালসুব্রহ্মণিয়ম	

রাহুল দেববর্মন সুরারোপিত হিন্দি ইংরেজি বেসিক গানের অ্যালবাম

১৯৮৭ - দিল পড়োসী হ্যায় (এইচ এম ভি)
১৯৯৫ - দিল তেরা হুয়া (ওয়েস্টন)
১৯৯৪ - তেরা মেরা পেয়ার জওয়ান (সাগরিকা)
১৯৮৭ - PANTERA
(English Album) (এইচ এম ভি)
INDIANA (এইচ এম ভি) প্রকাশিত হয়নি

অপূর্ব পোদ্দার

JULY 2002



সুরের যাদুকর রাহুলদেব বর্মন কে আর্য স্টুডিওর সশ্রদ্ধ প্রনাম

অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে ডাবিং - এর সুযোগ কোলকাতায় প্রথম ডলবি

আর্য ডিজিটাল স্টুডিও

- ন্যায্য খরচে আন্তরিক রেকডিং
- Multy-Track এবং ৬-১ সারাউন্ড - সহ কোলকাতায় প্রথম ডিজিটাল রেকডিং
- অত্যন্ত আন্তরিকভাবে নুতন শিল্পীদের গাইড দেওয়া হয়
- আমাদের ট্রাক ক্যাটালগ দেখে ডাবিং
- নতুন শিল্পীদের গানের ক্যাসেড রিলিজ আমাদের লেবেল orange থেকে
- অডিশন ক্যাসেট জমা দিন

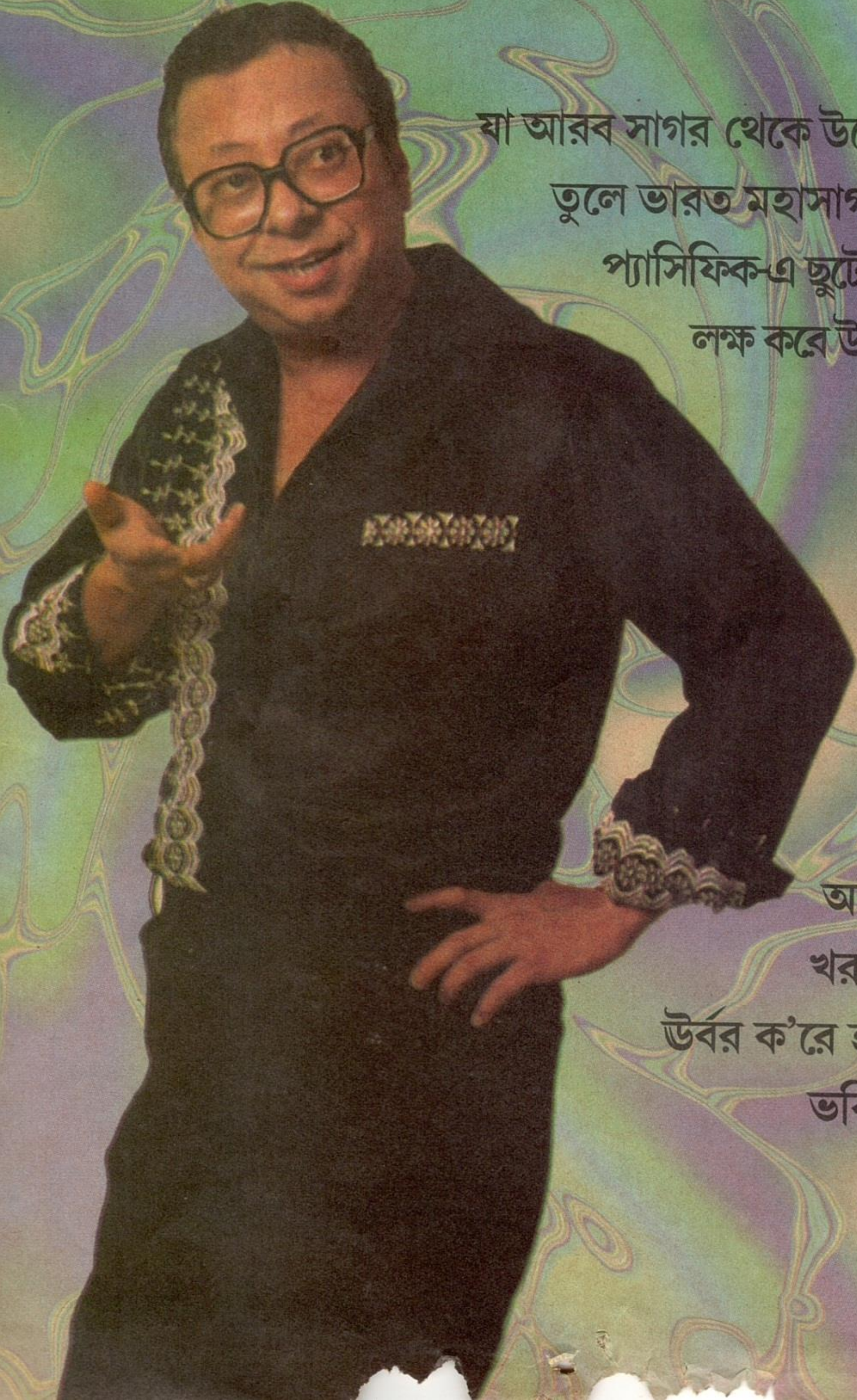


আর্য ডিজিটাল স্টুডিও

যোগাযোগ ঃ আর্য ডিজিটাল ষ্টুডিও
১০৭, এ ব্লক, বাংগুর এভিন্যু, (মাদার ডেয়ারীর নিকট) কলকাতা - ৭০০০৫৫
ফোন ঃ ৫৭৪-২১৫৫য়৫৭৪-০৮৬৩,ফ্যাকস ঃ ৫৭৪-০৪৬৩
ই-মেল ঃ aryandigital@vsnl.net.in
অফিস ঃ ২৮১, ক্যানাল স্টীট, (Lake Town/VIP) কোলকাতা-৭০০০৪৮

JULY 2002

একটা সাইক্লোন



যা আরব সাগর থেকে উঠে বঙ্গোপসাগরে ঢেউ
তুলে ভারত মহাসাগর হয়ে আটলান্টিক-
প্যাসিফিক-এ ছুটেছিল, সে হঠাৎ সূর্যকে
লক্ষ করে উর্ধ্বগামী হল; পৃথিবীর
জল থিতিয়ে গেল।
ক্ষণজন্মা প্রতিভারা
এভাবেই আসে
অপ্রত্যাশিত।
অকল্পিত, অসম্ভব
প্রত্যাশার সৃষ্টি করে
আবার চলে যায়
অপ্রত্যাশিত। পৃথিবীর
খরাকে রসান্বিত ক'রে,
উর্বর ক'রে হঠাৎ নির্বাসিত হয়।
ভবিষ্যৎ হয় উদ্ভাসিত।

...সলিল চৌধুরী